প্রাথমিক প্রতিবিধান

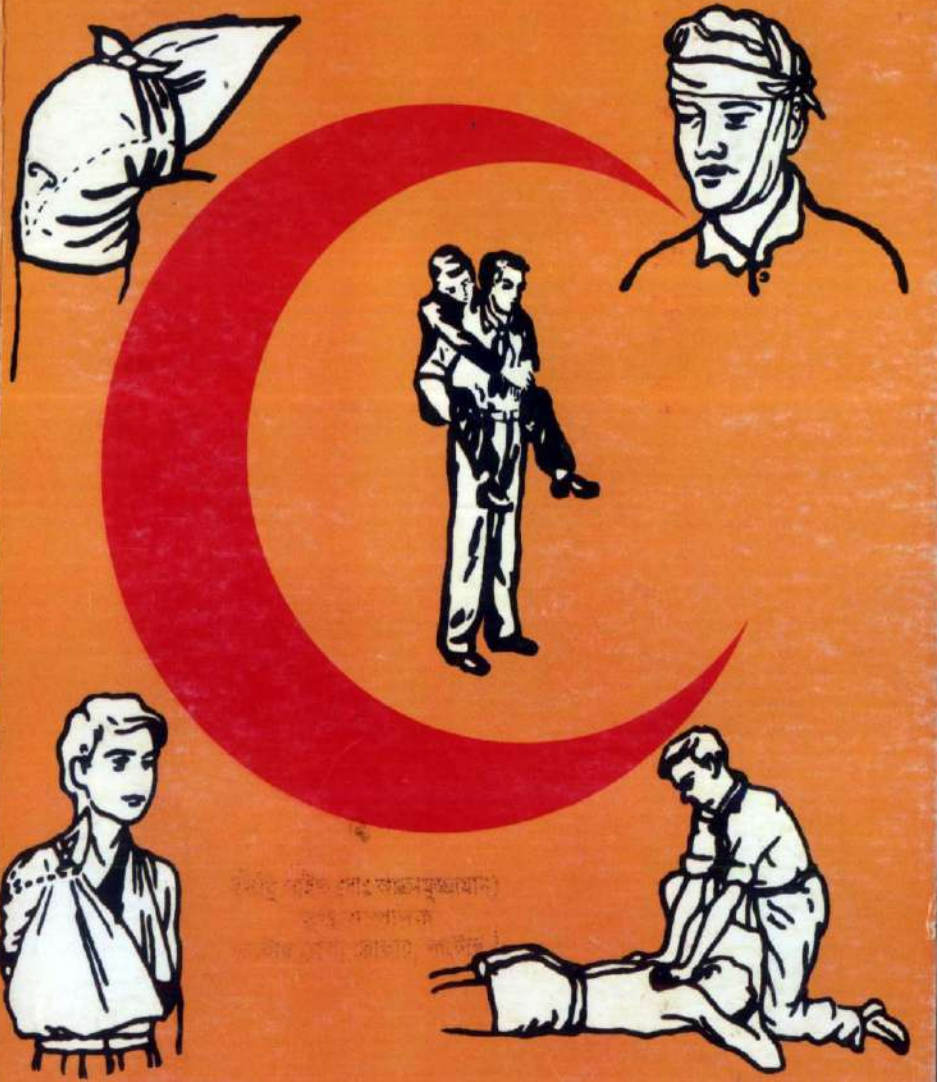

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

প্রাথমিক প্রতিবিধান

আমিনুর রহমান খান

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সড়ক
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনায় :
প্রশিক্ষণ বিভাগ
রোভার প্রকাশনী
রোভার ভবন
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সড়ক
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

রোভার প্রকাশনী কর্তৃক গ্রন্থের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮

দ্বিতীয় প্রকাশ
পৌষ, ১৩৯৯
ডিসেম্বর, ১৯৯২

তৃতীয় প্রকাশ
আশ্বিন, ১৪০৪
অক্টোবর, ১৯৯৭

৪র্থ প্রকাশ
ভাদ্র, ১৪০৮
সেপ্টেম্বর, ২০০১

৫ম প্রকাশ
২৮ বৈশাখ, ১৪১৭
১১ মে, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

৬ষ্ঠ প্রকাশ
জৈষ্ঠ্য, ১৪২১
মে, ২০১৪

প্রচ্ছদ : মো. আবুল কালাম চৌধুরী

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

মুদ্রণ :
মেলা, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, কম্পিউটার অ্যান্ড বুকস মার্কেট, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১১৩২৭০৫৯

প্রশিক্ষণ বিভাগ

রোভার প্রকাশনী

প্রশিক্ষণ– উপ-কমিটি

০১।	জনাব মো. রিয়াজুল ইসলাম বসুনীয়া, এল.টি	- আহবায়ক
০২।	প্রফেসর মো. রুহুল আমিন, ডিআরসি (প্রচার, প্রকাশনা ও জনসংযোগ)	- সদস্য
০৩।	জনাব এ কে এম সেলিম চৌধুরী, ডিআরসি (সংগঠন ও সম্প্রসারণ)	- সদস্য
০৪।	প্রফেসর শেখ বুলবুল কবীর, ডিআরসি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	- সদস্য
০৫।	জনাব মো. মনিরুজ্জামান, সম্পাদক, রোভার অঞ্চল	- সদস্য
০৬।	জনাব রাশেদ-উল-ইসলাম, জোয়ারদার, এ.এল.টি	- সদস্য
০৭।	জনাব মো. নাজমুল হক, সম্পাদক, হবিগঞ্জ জেলা রোভার	- সদস্য
০৮।	জনাব শরিফ মো. আরিফ মিহির, সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা রোভার	- সদস্য
০৯।	জনাব এ এস এম আব্দুর রশীদ, সম্পাদক, সাতক্ষীরা জেলা রোভার	- সদস্য
১০।	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন, সম্পাদক, কুষ্টিয়া জেলা রোভার	- সদস্য
১১।	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা জেলা রোভার	- সদস্য
১২।	জনাব মো. গোলাম মাসুদ, ফিল্ড অফিসার, রোভার অঞ্চল	- সদস্য
১৩।	জনাব মো. নাজমুল হক, খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি	- সদস্য
১৪।	জনাব মো. মুহাম্মদ এনামুল হক খান, যুগ্ম-সম্পাদক, রোভার অঞ্চল	- সদস্য সচিব

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং কল্যাণমুখী সংগঠনগুলোর মধ্যে স্কাউটিং অন্যতম। স্কাউটিং শুধু সংগঠনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, তা একটি আন্দোলনও বটে। তরুণদের সচতেন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হলো এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন বয়সের কিশোর, তরুণ ও যুবকদের সৎ, আদর্শ, সেবাপরায়ণ, ধার্মিক এবং কর্মঠ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিংয়ের রয়েছে একটি যুগোপযোগী এবং বাস্তবমুখী প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে একজন স্কাউটের আত্মনির্ভরশীল এবং দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা।

এ-কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্কাউট স্কিলের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। রোভার আঞ্চলিক স্কাউটসের উদ্যোগে রোভার প্রকাশনী এ-ধরনের কিছু পুস্তিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা নিয়েছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম।

প্রাথমিক প্রতিবিধান স্কাউটস্কিল বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ''সেবার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো''– এ হলো স্কাউটের মূলমন্ত্র। একে কার্যকর করার জন্য প্রাথমিক প্রতিবিধানের ওপর দক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছাড়া সার্থক স্কাউট হওয়া অসম্ভব। তাই স্কাউট প্রোগ্রামে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্কাউট ও স্কাউট নেতৃবৃন্দ এই পুস্তক থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আমি আশা করছি। রোভার প্রকাশনীর এই প্রয়াস স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

হাবিবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা।

ষষ্ঠ প্রকাশ কালের
সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জন্ম নিয়েছে স্কাউটিং। স্কাউট আন্দোলনের জনক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের মতে সেবা হলো স্কাউটিংয়ের প্রধান পূর্বশর্ত। অসহায়কে সেবা করার মাধ্যমে একজন স্কাউট যেরূপ তৃপ্তি পায়, সেরূপ বোধ হয় অন্য কোনো কাজে পায় না। তাই সেবা স্কাউটের স্বভাবজাত ধর্ম। প্রতিটি ধর্মে সেবাকারীর স্থান শীর্ষে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, "The best way of loving god is to love created being." অর্থাৎ "স্রষ্টাকে পাবার প্রধান উপায় হলো তার সৃষ্ট জীবকে ভালবাসা।" আর মানুষ "আশরুফুল মখলুকাত" বা সৃষ্টির সেরা জীব। কেউ যদি এই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্য কিঞ্চিৎ হলেও সেবাদান করতে পারে তবে তার জন্য এটা অত্যন্ত মর্যাদার কাজ। একজন স্কাউট প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে এরূপ আনন্দে কাজ করে নিজেকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এবং এভাবেই সে সমাজে অন্যতম সেবাকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

দক্ষ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হতে হলে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের পূর্বে প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। এ-কথা চিন্তা করেই আমরা রোভার প্রকাশনী থেকে স্কাউটের উদ্দেশ্যে "প্রাথমিক প্রতিবিধান" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। অতি অল্প সময়ে এরূপ একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য রোভার প্রকাশনীর পক্ষ থেকে স্কাউটার জনাব আমিনুর রহমান খানকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। আমরা সে-জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পুস্তিকাটির যে-কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করার জন্য স্কাউটার ও স্কাউট অনুরাগীরে প্রতি অনুরোধ রইল।

মো. মনিরুজ্জামান
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

তারিখ : ঢাকা
জৈষ্ঠ্য-১৪২১, মে-২০১৪

লেখকের কথা

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস্ আমাকে 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' বইটি লেখার দায়িত্ব প্রদান করার পর থেকে আমি দারুণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সময় অতিবাহিত করছিলাম। যাঁরা আমাকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছেন তাঁরা ১৯৭০ সাল থেকে বিভিন্ন স্কাউট প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতিবিধান বিষয়ক সেশনগুলো আমাকে নিতে দেখেছেন। বোধকরি সে কারণেই তাঁদের এ খেয়াল হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, কোনো বিষয়ে বই লিখতে হলে সে বিষয়ের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়া কারও পক্ষে এ-কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। যদিও প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছি কিন্তু তাই বলে বই লেখার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি না। অনেক আপত্তি তুলেও যখন কোনো লাভ হলো না, তখন নিরুপায় হয়ে আমি আমার ১৯৬৩ সালের বয়স্কাউট জীবনের উপদলনেতা প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় যে-সকল প্রাথমিক প্রতিবিধান কোর্স, সিভিল ডিফেন্স কোর্স, স্কাউট ইউনিট লীডার কোর্সের সেশন নোটসমূহ এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে কাজ করতে গিয়ে প্রবীণ স্কাউটার জনাব এম. ওয়াজিদ আলী, স্কাউটার জনাব মীর মুজিবুল হক এবং স্কাউটার জনাব মোফাখ্খার হোসেনের সাহচর্যে এসে এ-বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছি এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানের ওপর সংগৃহীত দেশি-বিদেশি লেখক ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন এবং বইসমূহের ওপর নির্ভর করে এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

এ-ক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে তা হলো স্কাউটাররা সকল সময় সেন্টজন এম্বুলেন্সের 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' বইকে অনুসরণ করে থাকেন। তাই আমাকেও একজন স্কাউট হিসেবে সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্সের বইকে সকল সময় অনুসরণ করতে হয়। আমাদের দেশের সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যগণও সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্সকেই অনুসরণ করে থাকেন। আর এ-কারণে আমার লিখনিতে সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্সের প্রভাব বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

প্রিয় স্কাউটবৃন্দ, বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে ট্রুপ/ক্রু মিটিং-এর আগে উপদলনেতাদের বিষয়টি শেখানোর সময় আলোচনায় প্রিয় স্কাউটারদের সাথে বসে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সে-কারণে এতে স্কাউটদের উদ্দেশ্যে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে কটি করে ট্রুপ/ক্রু মিটিং প্রয়োজন তা সূচিপত্রের পাশে লিপিবদ্ধ রয়েছে। গোটা বইটি সমাপ্ত করতে মোট ১২টি সাধারণ এবং ৬টি বিশেষ ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের প্রয়োজন হবে।

বয়স্কাউট এবং রোভার স্কাউটের সিলেবাসের প্রতি লক্ষ রেখে কেবল 'প্রণয়নের সুবিধার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে কটি করে ট্রুপ/ক্রু মিটিং প্রয়োজন তা সূচিপত্রের পাশে লিপিবদ্ধ রয়েছে। গোটা বইটি সমাপ্ত করতে মোট ১২টি সাধারণ এবং ৬টি বিশেষ ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের প্রয়োজন হবে।

বয়স্কাউট এবং রোভার স্কাউটের সিলেবাসের প্রতি লক্ষ রেখে কেবল 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' অংশটুকু এই বইতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে সিলেবাসের বাইরেও কিছু কিছু বিষয় প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে এসে গেছে। সেগুলো বয়স্কাউট রোভার স্কাউটদের জন্য প্রয়োজন বিধায় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, বইয়ে বর্ণিত প্রাথমিক প্রতিবিধান শিখে একজন স্কাউট যদি অন্তত একজন বিপদগ্রস্ত মানুষের যথার্থ সেবা করতে পারে তবেই আমি ভাববো আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

যারা তাঁদের মেধা ও শ্রম দিয়ে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের রোভার স্কাউট নেতা জনাব আবদুল হক তালুকদার, রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস'র ডেপুটি রিজিওনাল কমিশনার (প্রকাশনা) জনাব সায়েদুর রহমান, ডেপুটি রিজিওনাল কমিশনার (প্রোগ্রাম) শ্রী নির্মল কান্তি মিত্র, রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস'র সম্পাদক জনাব আফজাল হোসেন, ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট নেতা মীর মুজিবুল হক, বাংলাদেশ স্কাউটস'র শিল্পী শ্রী লক্ষণ সূত্রধর, রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস'র অফিস সহকারী শ্রী গীতানাথ বর্মন ও শুকুর মোহাম্মদ।

তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমিনুর রহমান খান

৬ষ্ঠ প্রকাশের ভূমিকা

শুধু মমতা দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবা করা যায় না। প্রয়োজন নিজেকে তৈরি করা। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এটা সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রোভার অঞ্চল প্রশিক্ষণের সহায়ক কিছু প্রয়োজনীয় বই-পত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। তারই ফলশ্রুতিতে এই ''প্রাথমিক প্রতিবিধান'' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। ইতোমধ্যে স্কাউটিং-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের কাছে বইটি অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ-জন্য বইয়ের লেখকসহ স্কাউট, স্কাউটার এবং স্কাউটমনা সকল শুভানুধ্যায়ীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অত্যন্ত আশার কথা এই যে, বইটির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ঢাকার কিছু কিছু প্রথম সারির উচ্চ বিদ্যালয়ে ''প্রাথমিক প্রতিবিধান'' বইটি পাঠ্য বই-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এর চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সহানুভূতির জন্য আমরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অঞ্চলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরই মধ্যে বইটির পরপর চারটি প্রকাশের প্রতি কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং চাহিদার কথা বিবেচনা করে অনেকটা তড়িঘড়ি করেই বইটি ষষ্ঠবারের মত প্রকাশ করা হলো। সঙ্গতকারণেই এবারেও কিছু মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থেকে গেল। পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের সুচিন্তিত মতামত পেলে পরবর্তীতে উৎকর্ষ সাধন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আশা রাখি।

এই সংস্করণে বইটির প্রচ্ছদসহ বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। যাঁরা মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি বইটি পূর্বের ন্যায় সকলের কাছে সমাদৃত হবে।

স্কাউটিং উন্নয়নে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হোক এটাই কাম্য।

ডঃ আরেফিনা বেগম
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
রোভার অঞ্চল

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	
এক			ট্রুপ/ক্রু মিটিং
	প্রাথমিক প্রতিবিধান কী? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর দায়িত্ব	১১	বিশেষ মিটিং-১
	প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি	১২	
	প্রাথমিক প্রতিবিধান পদ্ধতি	১৩	
দুই			
	অস্থি পরিচিতি	১৪	বিশেষ মিটিং-২
তিন			
	প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণসমূহ :	১৬	১ম মিটিং
	ক) ড্রেসিং		
	খ) লিন্ট		
	গ) প্যাড		
	ঘ) স্প্লিন্ট		
	ঙ) ব্যান্ডেজ		
	চ) রোলার ব্যান্ডেজ	১৭	
	ছ) রিফনট	২০	২য় মিটিং
	স্লিং	২১	
	রিং প্যাড	২৪	
	ব্যান্ডেজ বাঁধার পদ্ধতি :	২৬	
	ক) মাথার খুলিতে		৩য় ও ৪র্থ মিটিং
	খ) বুকে		
	গ) পিঠে		
	ঘ) কাঁধে		
	ঙ) কনুইতে	২৮	
	চ) হাতে	২৯	
	ছ) উরুতে	৩০	
	জ) হাঁটুতে		
	ঝ) পায়ে	৩১	
চার			
	ক্ষত	৩২	বিশেষ মিটিং-৩ ও
	রক্ত ও রক্তক্ষরণ	৩৩	৫ম মিটিং

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	
পাঁচ			
	স্নায়ুবিক আঘাত	৪৯	ট্রুপ/ক্রু মিটিং
	শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালি	৫১	বিশেষ মিটিং-৪
	এসফিক্সিয়া	৫২	
	বৈদ্যুতিক আঘাত	৫৬	৬ষ্ঠ ও ৭ম মিটিং
	কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস	৫৮	
ছয়			
	অস্থিভঙ্গ	৭০	৮ম, ৯ম, ১০ম মিটিং
	সন্ধিচ্যুতি	৮৬	
	মচকানো		
সাত			
	দাহ	৮৮	বিশেষ মিটিং-৫
	কামড় বা দংশন	৯০	
	বিষ প্রক্রিয়া	৯৩	
	রক্তশোষক	৯৫	
	হুল ফোটা		
	চোখে কিছু পড়লে	৯৬	১১তম মিটিং
	কানে কিছু গেলে	৯৮	ও
	অজ্ঞান অবস্থা		বিশেষ মিটিং-৬
	রোগী বহন	৯৯	১২তম মিটিং
	রোগী বহন পদ্ধতি :	১০০	
	ক) ক্রেডল		
	খ) হিউম্যান ক্রাচ		
	গ) পিক-এ-ব্যাক	১০১	
	ঘ) ফায়ার ম্যানস লিফট		
	ঙ) হাতের আসন	১০২	
	চ) ফোর অ্যান্ড এফ্ট মেথড	১০৫	

অধ্যায় : এক

প্রাথমিক প্রতিবিধান ও প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী

দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তোমরা যারা বিশ্বস্কাউট আন্দোলনের সদস্য হয়েছ তারা ইতোমধ্যেই স্কাউট প্রতিজ্ঞা এবং আইনের সাথে পরিচিত হয়েছে। স্কাউট প্রতিজ্ঞায় 'প্রতিদিন কারো না কারো' উপকার করতে বলা হয়েছে। আর তোমার মটো বা মূলমন্ত্র হলো 'সেবা'। এই সেবার অর্থ কিন্তু ব্যাপক। একে বিশেণ্ডষণ করলে এক পর্যায়ে তুমি আর্ত-মানবতার সেবার কথাও পাবে।

পথে ঘাটে চলার সময় এমনকি নিজের বাড়ি বা মহল্লাতেও প্রায়ই হঠাৎ করে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এ-সকল দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের সাহায্য করার সুযোগ গ্রহণ করে একজন স্কাউট তার প্রতিজ্ঞা ও মটোর সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে। এরূপ আহত বা অসুস্থ কাউকে সাহায্য করতে পারলে দারুণ আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। কিন্তু এ-কাজ একেবারে সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে সম্যক-জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের।

যে জ্ঞানের দ্বারা ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের পথ সুগম করতে এবং অবস্থার যাতে আর অবনতি না হয় তার ব্যবস্থা করতে পারা যায় তাকেই প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে। আর যিনি প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজে অংশ নেন তাকেই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী বলে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ডাক্তার এসে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করার পর একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর যদিও আর কোনো দায়িত্ব থাকে না তথাপি রোগীর অবস্থা সম্পর্কে ডাক্তারের নিকট রিপোর্ট করার পর একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে কিছু সময় তোমার সেখানে অবস্থান করা প্রয়োজন। কারণ হঠাৎ সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

একজন স্কাউট আত্মনির্ভরশীল। স্কাউট কখনই তাদের কাজে নির্ধারিত জিনিসপত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে না আর প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে তো

নয়ই। প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তা দিয়েই প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হয়। কেউ কখনো বলতে পারে না কখন কোন ধরনের অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা কবলিত রোগী পাওয়া যাবে। আর তা প্রতিবিধানের জন্য কী কী সামগ্রীর প্রয়োজন হবে। তাই হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে খেয়াল রাখতে হবে যে, কখনো ডাক্তারের ভূমিকা গ্রহণ করতে যাওয়া উচিত নয়। তোমাকে যে-কোনো অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সকল সময় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

কোনো রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধান প্রদান করতে হলে তোমাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে–

* কী কারণে রোগ বা অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে? (লক্ষণ, চিহ্ন বা ইতিহাস থেকে তা পাওয়া যাবে)

* কী এবং কতটুকু চিকিৎসার প্রয়োজন? (রোগী জীবিত না মৃত সন্দেহ থাকলে ডাক্তার না-আসা পর্যন্ত প্রাথমিক প্রতিবিধান চালিয়ে যেতে হবে)।

* নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি

তুমি যদি একজন সফল প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হতে চাও তাহলে তোমাকে নিম্নলিখিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে :

১. সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলেই দ্রুত সাড়া দিতে হবে।

২. পদ্ধতিগত উপায়ে ধীরস্থিরভাবে নিরীক্ষণের কাজ শেষ করে প্রয়োজনীয় প্রতিবিধানে ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. শ্বাসরোধ, রক্তক্ষরণ, স্নায়ুবিক আঘাত ইত্যাদির প্রতিবিধান আগে করে তারপর অন্য কাজে হাত দিতে হবে।

৪. নির্ধারিত উপকরণের ওপর নির্ভর না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়

তা দিয়েই প্রতিবিধানের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

৫. পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন– টলায়মান গৃহ, চলমান যানবাহন বা যন্ত্রপাতি, বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক তার, আগুন, বিষাক্ত গ্যাস, প্রতিকূল আবহাওয়া, আশ্রয়, আলো ইত্যাদি।

প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রেও কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান পদ্ধতি

(ক) ক্ষিপ্র গতিতে অথচ শান্ত মাথায় নিঃসংকোচে আগের কাজ আগে এবং পরের কাজ পরে এই নীতিতে কাজ করতে হবে।

(খ) শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন দেখা দিলে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) রক্তক্ষরণ বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) স্নায়ুবিক আঘাতের চিকিৎসা করতে হবে।

(ঙ) যতটুকু না করলেই নয় শুধু ততটুকু করতে হবে। কোনোক্রমেই অধিক নড়াচড়া বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না।

(চ) রোগী এবং উপস্থিত সকলকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিতে হবে।

(ছ) দর্শনার্থী যাতে অধিক ভিড় করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) অযথা কাপড়-চোপড় খোলা যাবে না।

(ঝ) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের নিকট নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় : দুই
অস্থি পরিচিতি

স্কাউট ভাইয়েরা, এতক্ষণ তোমাদের সাথে প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রাথমিক কথা আলোচনা করা হলো। এই প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে যদি ভালভাবে জানতে চাও তোমাদের মানবদেহ সম্পর্কে কিছুটা জানতে হবে।

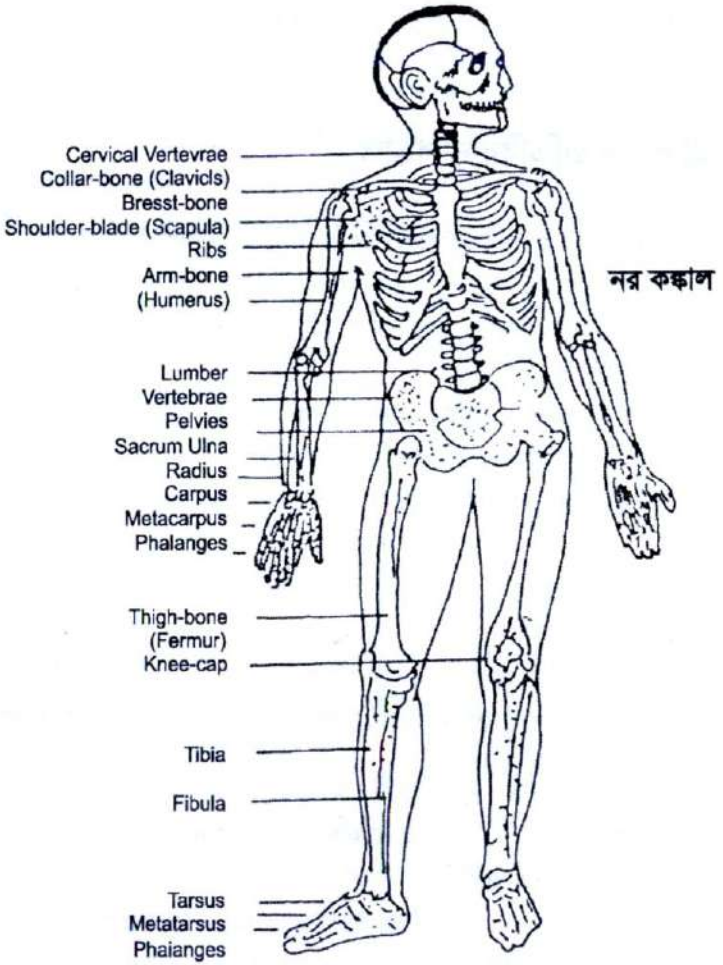

[দেহ কাঠামো ও অস্থি পরিচিতি]

দেহের গঠন বা কাঠামো, দেহতন্ত্র বা টিস্যু এবং দৈহিক ক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না থাকলে সঠিকভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজ করা মোটেও সম্ভব নয়।

অনেক হাড়ের সমন্বয়ে দেহ-কাঠামো গঠিত। দেহ-কাঠামোর ওপরই মানুষের আকৃতি নির্ভর করে এবং শরীরকে শক্ত রাখে। মাংসপেশীগুলোকে যুক্ত রাখে, মাথা, বুক ও পেটের ভিতরের প্রধান প্রধান শরীর যন্ত্রগুলোকে রক্ষা করে। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহে ছোট-বড় মিলিয়ে ২০৬টি হাড় থাকে। হাতে এবং পায় বেশ বড় বড় আবার হাতের তালু এবং পায়ের পাতা ছোট ছোট হাড় দিয়ে তৈরি।

আগের পৃষ্ঠায় নরকংকাল থেকে তোমরা মানবদেহের কাঠামো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা অর্জন করতে পারবে। চিত্রের পার্শ্বে বর্ণিত হাড়গুলোর নাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহলে, পরবর্তীতে প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

অধ্যায় : তিন

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রিয় স্কাউটবৃন্দ, চল এবার প্রাথমিক প্রতিবিধানে যে-সকল উপকরণের ব্যবহার ও কৌশল অবলম্বন করা হয় তার সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

ড্রেসিং : কোনো ক্ষতস্থানে যে আবরণ বা আচ্ছাদন দেয়া হয় তাকে ড্রেসিং বলে। নিম্নলিখিত কারণে ড্রেসিং ব্যবহার করা হয়। (১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করা। (২) ক্ষতস্থানে আবার যাতে বাইরের কোনো দূষিত কিছু না লাগে তার ব্যবস্থা করা।

লিন্ট : লিন্ট হলে ঔষধযুক্ত ও জীবাণুমুক্ত একখণ্ড কাপড়। ক্ষতস্থান ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে ক্ষতস্থানে এমনভাবে লিন্ট স্থাপন করা হবে যাতে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ ঢেকে থাকে।

প্যাড : ক্ষতস্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য প্যাড ব্যবহার করতে হয়। ক্ষতস্থানে লিন্ট স্থাপন করে তার ওপর প্যাড ব্যবহার করতে হবে। প্যাড তুলা বা পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত নরম কাপড়ের হতে পারে। প্যাড ব্যবহারের সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে সম্পূর্ণ ক্ষতস্থান জুড়ে তা অবস্থান করে।

স্প্লিন্ট : অস্থিভঙ্গ হলে স্প্লিন্ট বা চটি ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাস্থির আকৃতির ওপর ভিত্তি করে স্প্লিন্ট-এর সাইজ নির্ণয় করতে হয়। পাতলা কাঠ হার্ডবোর্ড বা বাঁশের চটা দিয়ে স্প্লিন্ট তৈরি করা যায়।

ব্যান্ডেজ : লিন্ট, প্যাড বা স্প্লিন্ট যথাস্থানে রাখা এবং ভগ্নাস্থি স্থির করে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। ব্যান্ডেজ ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে ক্ষতস্থানের ঠিক উপরে যাতে ব্যান্ডেজের গেরো না পড়ে। রক্তক্ষরণ বন্ধ, স্ফীতি রোধ, রোগী বহনের সুবিধা ইত্যাদি কারণেও ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। ব্যান্ডেজ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে : ১. রোলার ব্যান্ডেজ এবং ২. ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ।

১. রোলার ব্যান্ডেজ (Roller Bandage)

কাপড়ের গোল করে জড়ান যে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয় সেটাকে রোলার ব্যান্ডেজ বলে। রোলার ব্যান্ডেজ সাধারণত ১ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। পাতলা কাপড়ের সাহায্যে রোলার ব্যান্ডেজ তৈরি করা হয়। আহত অঙ্গের সাইজ এবং ক্ষতস্থানের আকৃতির ওপর ভিত্তি করে রোলার ব্যান্ডেজ সাইজ নির্ণয় করা হয়। তবে সাধারণত :

আঙ্গুলে	১ ইঞ্চি
মাথা ও বাহুতে	২ থেকে ২½ ইঞ্চি
পায়ে	৩ থেকে ৩½ ইঞ্চি
দেহকাণ্ডে	৪ থেকে ৬ ইঞ্চি সাইজের হয়ে থাকে।

রোলার ব্যান্ডেজের যে অংশ খোলা থাকে তাকে মুক্তপ্রান্ত এবং জড়ান অংশকে শীর্ষ বলে।

রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধার সাধারণ নিয়ম

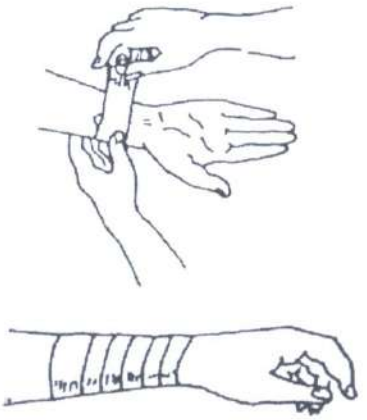

[রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধার নিয়ম]

ক. আহত অঙ্গের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

খ. রোগীর যদি বামদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় তবে তোমার ডানহাতে আর রোগীর ডানদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে তোমার বাম হাতে ব্যান্ডেজের জড়ান অংশ বা শীর্ষ রাখতে হবে।

গ. মুক্তপ্রান্ত একটু বাড়তি রেখে আহত স্থানের ওপর স্থাপন করে ব্যান্ডেজ জড়াতে হবে।

ঘ. নিচ থেকে উপর দিকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় এবং বাইরের দিক থেকে এনে সামনের দিকে রিফনট দিয়ে শেষ করতে হয়।

ঙ. ব্যান্ডেজের প্রতিস্তর যেন পূর্বের স্তরের অন্তত ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) ঢেকে রাখে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চ. ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন তা খুব শক্ত করে বাঁধা না হয়।

২. ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ (Triangular Bandage)

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী এবং স্কাউটগণ এই ধরনের ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে থাকে। কারণ এ-ধরনের একটা ব্যান্ডেজ প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সাইজে রূপান্তর করা যায়। ৩৮ ইঞ্চি বা প্রায় এক মিটা দৈর্ঘ্যপ্রস্থের একখণ্ড কাপড় কোনাকুনিভাবে কাটলে ২টি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ পাওয়া যায়। ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের আকার নিম্নরূপ :

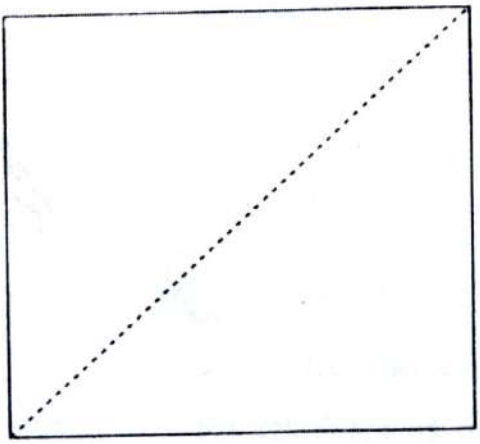

[ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ প্রস্তুত পদ্ধতি]

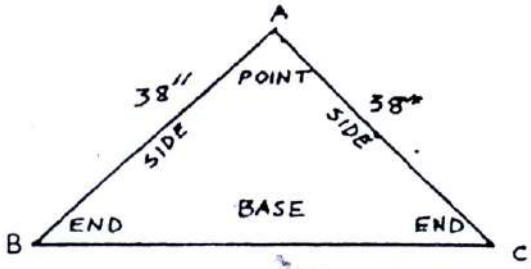

উপরের ত্রিকোণ ব্যান্ডেজে A হল শীর্ষ, B এবং C হল দুইটি প্রান্ত। B C বাহু হল ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ভূমি।

ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ বিভিন্ন আকারে ব্যবহার করা হয়

(এক ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ)

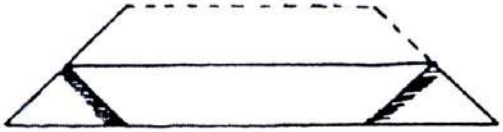

(দুই ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ)

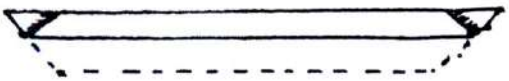

(সরু ব্যান্ডেজ)

ক. **ফুল সাইজ ব্রড ব্যান্ডেজ :** যখন পূর্ণ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজটিই ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে ফুল ব্রড ব্যান্ডেজ বা পূর্ণ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ বলে।

খ. **ব্রড ব্যান্ডেজ :** যখন একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের শীর্ষকে ভূমির মধ্যখানে স্থাপন করে ব্যান্ডেজের অর্ধেক ভাঁজ করা হয় তখন তাকে ওয়ান ফোল্ড ব্রড বা এক ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ বলে।

ওয়ান ফোল্ড ব্রড ব্যান্ডেজকে আরও এক ভাঁজ করা হলে তাকে টুফোল্ড ব্যান্ডেজ বা দুই ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ বলে।

গ. ন্যারো বা সরু ব্যান্ডেজ : চওড়া ব্যান্ডেজকে এর পর যত ভাঁজই করা হোক না কেন তাকে ন্যারো ব্যান্ডেজ বা সরু ব্যান্ডেজ বলা হয়।

রিফনট

ব্যান্ডেজ জড়ানোর পর ব্যান্ডেজের দুই প্রান্ত বেঁধে রাখার যে গেরো ব্যবহার করা হয় তাকে রিফনট বা ডাক্তারী গেরো বলে।

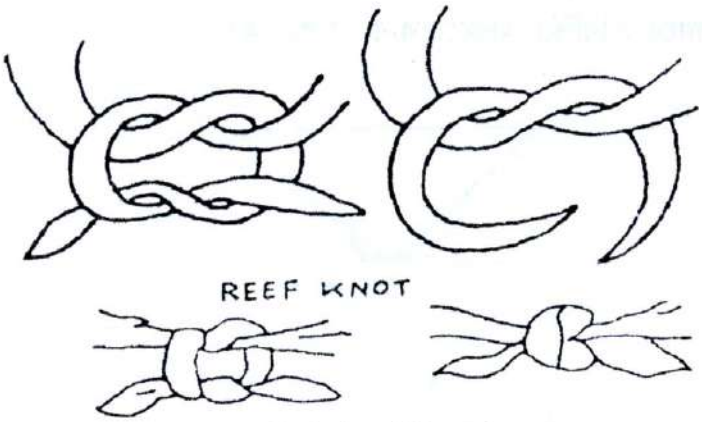

(রিফনট বাঁধার বিভিন্ন পর্যায়)

রিফনট বা ডাক্তারী গেরো বাঁধার পদ্ধতি : দুই প্রান্ত দুই হাতে ধর। এবার ডানহাতের প্রান্তের ওপর বাম হাতের প্রান্ত রাখ, তারপর একটি প্যাঁচ দাও। আবার বামহাতের প্রান্তের ওপর ডান হাতের প্রান্ত রেখে আর একটি প্যাঁচ দাও। এবার উভয় প্রান্ত ধরে টান। এতে যে গেরো সৃষ্টি হলো সেটাই রিফনট বা ডাক্তারী গেরো।

এই গেরো ব্যবহারের সুবিধাজনক দিক হলো এটা সহজে বাঁধা ও খোলা যায় এবং গেরোর নিচে শক্ত চাপ পড়ে না। তাই ডাক্তারগণ এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীগণ ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজে এই গেরো ব্যবহার করে থাকেন।

স্লিং (Sling) : আহত স্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য স্লিং ব্যবহার করা হয়। দেহের উর্ধ্বাঙ্গ ভঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণত স্লিং ব্যবহার করা হয়।

স্লিং কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন–

ক. আর্ম স্লিং

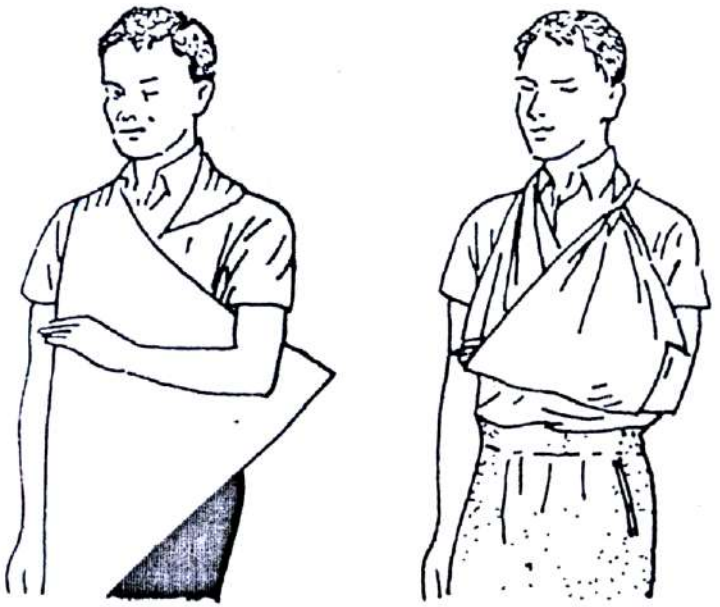

(আর্মি স্লিং বাঁধার দুটি পর্যায়)

অগ্রবাহু আরামে ঝুলিয়ে রাখার জন্য শুধু এই স্লিং ব্যবহার করা হয়।
একটি ভাঁজ ছাড়া ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে তার এক প্রান্ত সুস্থ দিকে কাঁধের ওপর রাখতে হবে। ঐ প্রান্তটিই ঘাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে আহত দিকের কাঁধের ওপর আনতে হবে। অপর প্রান্তটি বুকের সম্মুখভাগে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এবার

ব্যান্ডেজের মাঝখানে আহত হাতটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে শীর্ষ কনুই-এর পেছন দিকে থাকে এবং অগ্রবাহু ও বাহুর মধ্যে ৯০° কোণ উৎপন্ন হয়। এবার দ্বিতীয় প্রান্তটি অগ্রবাহুর উপর দিয়ে নিয়ে প্রথম প্রান্তটির সাথে বাঁধতে হবে এবং শীর্ষটি কনুই পর্যন্ত এনে সেফটিপিন দিয়ে ব্যান্ডেজের সামনের দিকে এঁটে দিতে হবে।

খ. কলার অ্যান্ড কাপ স্লিং

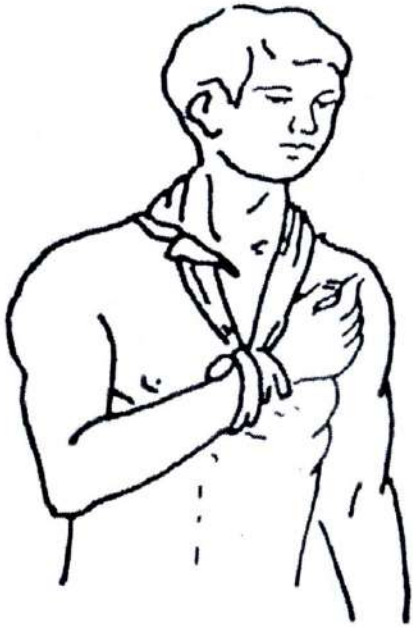

ঊর্ধ্ববাহু আহত হলে সাধারণত এই ধরনের স্লিং ব্যবহার করা হয়। নিম্নবাহুর নড়াচড়া বা ঝুলিয়ে রাখা আহত ঊর্ধ্ববাহুর জন্য ক্ষতিকর বলেই এ-ধরনের স্লিং-এর ব্যবহার আবশ্যক। এই স্লিং ব্যবহার করতে প্রথমে আহত হাতটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আহত হাতের আঙ্গুলগুলো অপর কাঁধ স্পর্শ করতে পারে। একটি সরু ব্যান্ডেজ নিয়ে তার মাঝামাঝি জায়গায় আহত হাতের কব্জিতে ক্লোভহিচ দিতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি গলার দুই পাশ দিয়ে নিয়ে আহত বাহুর দিকে বেঁধে দিতে হবে।

গ. ত্রিকোণ স্লিং (Triangular Sling)

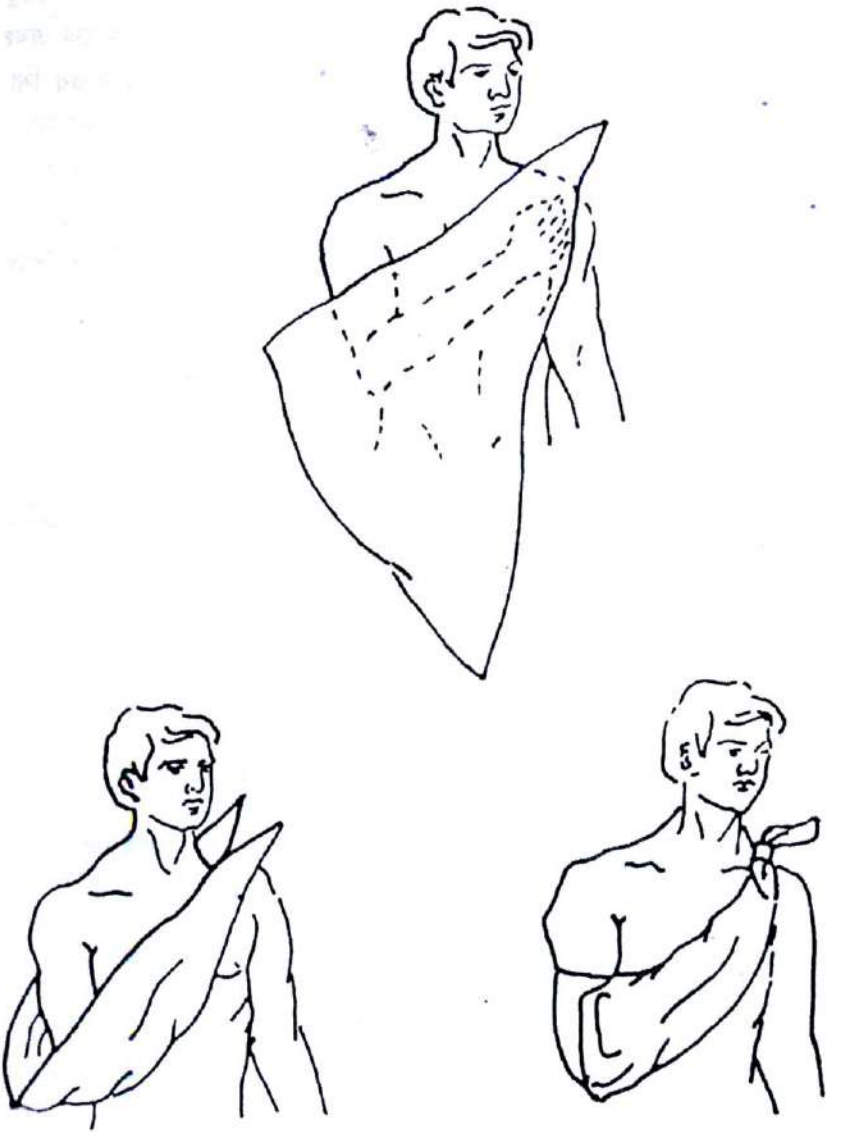

(ত্রিকোণ স্লিং ব্যবহারের পর্যায়)

আহত দিকের হাতটি এমনভাবে বুকের ওপর রাখতে হবে যাতে আঙ্গুলগুলো অপর পার্শ্বের কণ্ঠাস্থি স্পর্শ করে এবং তালু বুকের ওপর মেলানো অবস্থায় থাকে। এবার একটি ভাঁজবিহীন ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে এমনভাবে বুকের ওপর স্থাপন করতে হবে যাতে শীর্ষ আহত ভাঁজ করা হাতের কনুই বরাবর একটু বাইরের দিকে থাকে, এক প্রান্ত বুকে রাখা হাতের আঙ্গুলের উপরে থাকে এবং অপর প্রান্ত সোজাসুজি সামনের দিকে ঝুলে থাকে। এবার আহত বাহুর নিচ দিয়ে ঝুলন্ত প্রান্তটি পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁধের ওপর অন্য প্রান্তের সাথে বেঁধে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে শীর্ষসহ ব্যান্ডেজের বাড়তি অংশ ব্যান্ডেজ ও বাহুর মধ্যবর্তী কাঁধে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে প্রবেশ করাতে হবে। এতে যে ভাঁজটির সৃষ্টি হবে তা একটু টেনে বাহুসংলগ্ন ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিপিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

ঘ. ইম্প্রোভাইজড বা বিকল্প স্লিং

উল্লিখিত স্লিংগুলি ছাড়াও প্রয়োজনে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে স্লিং তৈরি করে যদি কাজ সম্পন্ন করা যায় তবে সেই স্লিংকে ইম্প্রোভাইজড বা বিকল্প স্লিং বলা হয়।

ঙ. রিং প্যাড

মাথার উপরিভাগ আহত হলে অধিক রক্তক্ষরণ বন্ধের ক্ষেত্রে রিংপ্যাড ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে, কাঁচ বা ঐ জাতীয় কোনো কিছুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিঁধে থাকা এবং ভিতরে অস্থি ভঙ্গের আশঙ্কা করা হলে রিংপ্যাডের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

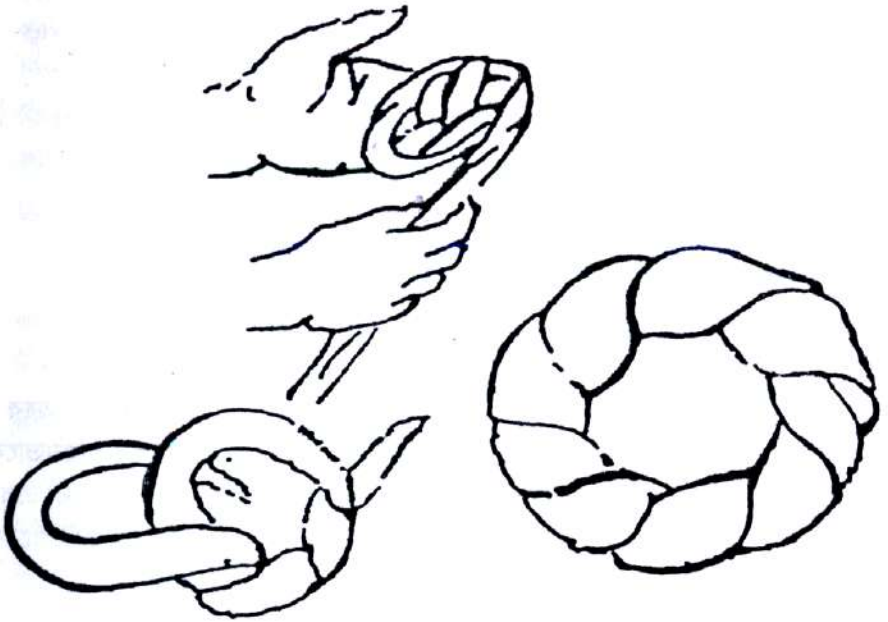

(রিং প্যাড তৈরি পদ্ধতি)

একটি সরু ব্যান্ডেজের একপ্রান্ত হাতের আঙ্গুলে জড়িয়ে অপরপ্রান্ত দিয়ে এমনভাবে মুড়াতে হবে যাতে একটি রিংয়ের মত বা বিড়ার মত হয়।

এতক্ষণ তোমরা ব্যান্ডেজ, স্লিং ও স্প্লিট ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়েছ। এখন তোমাদের জানা দরকার কী করে এগুলোর সাহায্যে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়। একটা কথা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দেহের বিভিন্ন স্থানের অস্থিভঙ্গ বা ক্ষতের জন্য বিভিন্নভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়। চল এবার আলোচনা করা যাক দেহের কোন অংশে কী ধরনের এবং কিভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।

ব্যান্ডেজ বাঁধার পদ্ধতি

মাথার খুলিতে

(মাথার খুলিতে ব্যান্ডেজ বাঁধার বিভিন্ন পর্যায়)

একটি ভাঁজবিহীন ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ভূমিতে একটু চওড়া ভাঁজ করতে হবে। এবার আহত ব্যক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডেজটি তাও মাথার ওপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন ভূমির উক্ত ভাঁজ তার কপালের ভূরুর ঈষৎ উপরে থাকে এবং শীর্ষ নিচের দিকে ভাল করে টেনে উল্টিয়ে মাথার উপরের দিকে সেফটিপিনের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে।

বুকের সামনের অংশে

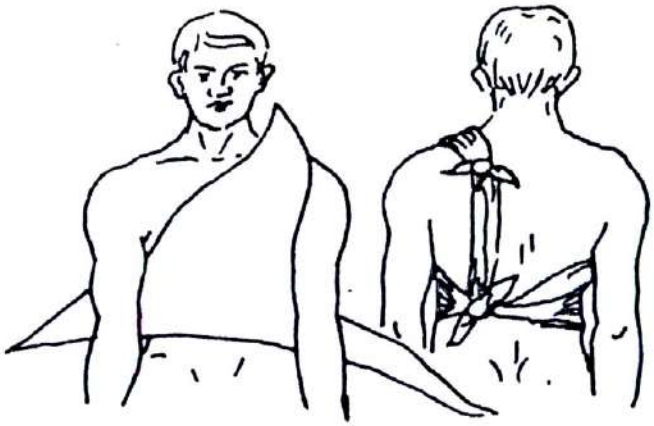

(বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধার পদ্ধতি)

আহত ব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়াও। একটি ভাঁজবিহীন ব্যান্ডেজ আহতস্থানের ওপর এমনভাবে রাখ যেন শীর্ষ আহত পার্শ্বের কাঁধের ওপর থাকে। এবার ব্যান্ডেজের ভূমিতে ঈষৎ চওড়া একটি ভাঁজ কর। তারপর প্রান্ত দুটি দুই হাতের নিচ দিয়ে পিছনে নিয়ে কোমরের উপরিভাগে এমনভাবে বেঁধে দাও যেন একটি প্রান্ত কিছুটা বড় থাকে। সবশেষে কাঁধে স্থাপন করা শীর্ষ টেনে নিয়ে লম্বা প্রান্তের সাথে বেঁধে দাও।

পিঠের দিকে

পিঠের ব্যান্ডেজের বেলায় ঠিক বুকে যেমন করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছিল তেমনি করেই বাঁধতে হবে। কেবল মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে এবং প্রান্ত ও শীর্ষ পেছনে না নিয়ে সামনে নিতে হবে।

কাঁধে

আহত ব্যক্তির ক্ষত স্থানের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। এবার একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ভূমিতে ঈষৎ চওড়া (প্রয়োজন বোধে একাধিক ভাঁজ করে) এমনভাবে স্থাপন কর যেন ব্যান্ডেজের মধ্য ভাগ ক্ষত স্থানের উপরে থাকে এবং শীর্ষ কান পর্যন্ত স্পর্শ করে। নিচে কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখানো হল :

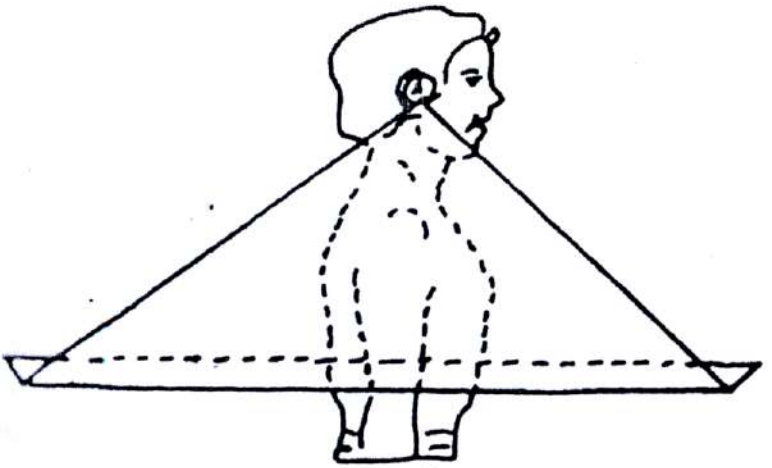

(প্রথম পর্যায়)

(দ্বিতীয় পর্যায়)

(তৃতীয় পর্যায়)

এবার প্রান্ত দুটি উর্ধ্ববাহুর মাঝামাঝি জড়িয়ে উভয় প্রান্তে বেঁধে দাও। তারপর ঐ আহত বাহু যথাস্থানে রাখার উদ্দেশ্যে বাহুতে আর্মস্লিং ব্যবহার কর। এবার প্রথম ব্যান্ডেজের শীর্ষ স্লিং-এর গেরোর ওপর দিয়ে উল্টিয়ে দিয়ে সেফটিপিনের সাহায্যে আটকিয়ে দাও।

কনুইতে

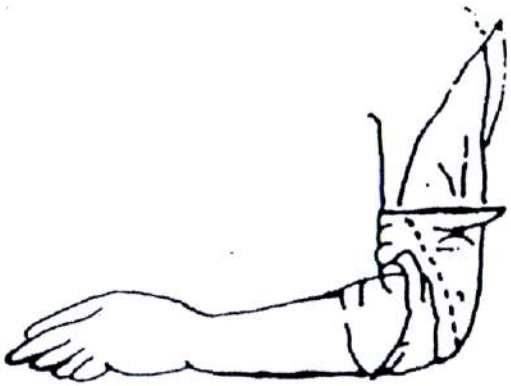

আহত কনুইটি এক সমকোণের মত করে সামনে ভাঁজ করে স্থাপন কর। এবার একটি নির্ভাজ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে ব্যান্ডেজের ভূমিতে এক বা একাধিক চওড়া ভাঁজ কর। তারপর ব্যান্ডেজটিকে এমনভাবে স্থাপন কর যেন শীর্ষ উর্ধ্ববাহুর মধ্যভাগ পার হয়ে থাকে এবং প্রান্ত দুটি দিয়ে নিম্ন বাহুর উপরিভাগ ও উর্ধ্ব বাহুর মধ্যভাগ জড়িয়ে উভয় প্রান্ত উর্ধ্ব বাহুতে বেঁধে দাও। পরিশেষে ভাল করে টেনে নিচের দিকে উল্টিয়ে সেফটিপিনের সাহায্যে ব্যান্ডেজের সাথে আটকিয়ে দাও।

হাতে

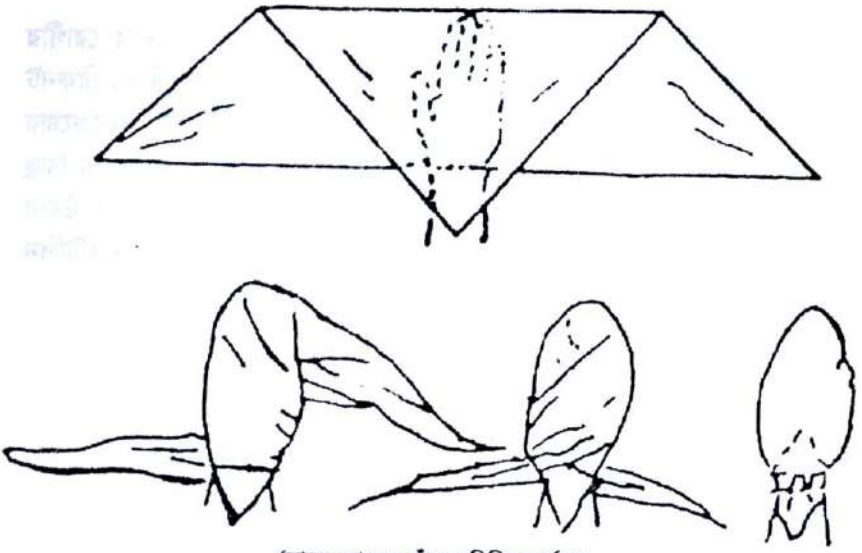

(হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার বিভিন্ন পর্যায়)

একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে তার ভূমিতে একটু চওড়া ভাঁজ করে নাও। এবার ব্যান্ডেজটি হাতের নিচে এমনভাবে স্থাপন কর যাতে ঐ ভাঁজটি কব্জির নিচে থাকে। তারপর শীর্ষটি এমনভাবে ভাঁজ করে কব্জির ওপর আন যাতে আঙ্গুলগুলি ঢাকে। এখন দুই প্রান্ত কব্জিতে আড়াআড়িভাবে জড়িয়ে রিফনট দাও। এবার শীর্ষ ভাল করে টেনে গেরোর উপর দিয়ে নিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিপিন দিয়ে আটকিয়ে দাও।

উরুতে

যে উরুতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে সেদিকে মুখ করে দাঁড়াও। এবার রোগীর কোমরে একটি সরু ব্যান্ডেজ বাঁধ। খেয়াল রাখতে ব্যান্ডেজের প্রান্তে যে রিফনট দিবে তা যেন আহত দিকে থাকে। এবার একটি ভাঁজহীন ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের শীর্ষ পূর্বের ব্যান্ডেজ ও কোমরের মাঝ দিয়ে এমনভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন কিছু অংশ সামনের দিকে ঝুলে থাকে। তারপর ব্যান্ডেজের ভূমিতে রোগীর উরুর রিফনট বাঁধ। এরপর ব্যান্ডেজের ঝুলন্ত শীর্ষটি ভাল করে টেনে সেফটিপিন দিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে আটকে দাও।

হাঁটুতে

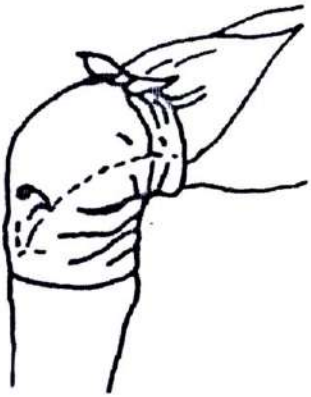

আহত হাঁটু সমকোণ করে রাখ। একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে তার ভূমিতে চওড়া ভাঁজ কর এবং ঐ ব্যান্ডেজটির শীর্ষ হাঁটুর উপর দিয়ে উরুতে রাখ। এবার প্রান্ত দুইটি প্রথমে উরুর পেছন দিয়ে আড়াআড়ি করে জড়িয়ে নিয়ে রিফনট দিয়ে বেঁধে দাও। এখন শীর্ষ ভাল করে টেনে রিফনট-এর উপর দিয়ে নিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিপিন দিয়ে আটকে দাও।

পায়ে

একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ভূমিতে একটু সরু ভাঁজ দাও। আহত পা ব্যান্ডেজটির মধ্যখানে এমনভাবে রাখ যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো শীর্ষ বরাবর থাকে। এবার শীর্ষটিকে টেনে পায়ের উপরের অংশে আন। তারপর ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি গোড়ালিতে আড়াআড়িভাবে জড়িয়ে সামনের দিকে রিফনট দিয়ে বেঁধে দাও। তারপর শীর্ষ আর একবার ভাল করে টেনে সামনের দিকে নিয়ে এসে সেফটিপিন দিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে আটকে দাও।

অধ্যায় : চার

ক্ষত

অবিচ্ছিন্ন দেহতন্তু ছিন্ন হলে ছিদ্র সৃষ্টি হয়– এ অবস্থাকেই ক্ষত বলে। এই ছিদ্র পথে দেহ থেকে রক্ত বাহিরে আসে এবং ঐ পথেই আবার নানা প্রকার রোগ জীবাণু প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ক্ষত কয়েক প্রকারের হতে পারে :

ক. **কর্তনজনিত ক্ষত :** অতি ধারাল যেমন– ব্লেড, ক্ষুরা, ভাংগা কাঁচ বা শামুক ইত্যাদির সাহায্যে যখন ক্ষত সৃষ্টি হয় তখন তাকে কর্তনজনিত ক্ষত বলে। এই ধরনের ক্ষতে রক্তনালী পরিষ্কারভাবে কেটে যায় এবং অবিরাম রক্তপাত হয়।

খ. **ছিন্নভিন্ন ক্ষত :** জীবজন্তুর নখ, কলকব্জা, শেলের টুকরা, ইত্যাদির সাহায্যে যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন রক্তনালীগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এ-ধরনের ক্ষতকে ছিন্নভিন্ন ক্ষত বলে। এ-ক্ষেত্রে অবিরাম রক্তপাত হয় না। কখনো-বা কিছু সময়ের জন্য রক্তপাত বন্ধ থাকতে দেখা যায়।

গ. **পিষ্ট ক্ষত :** যখন দেহের তন্তুসমূহ থেতলে বা পিষে যায় তখন তাকে পিষ্টজনিত ক্ষত বলে। যেমন– কোনো ভোঁতা যন্ত্রের সাহায্যে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, গাড়ির চাকার নিচে পড়ে, ভারী কোনো কিছু গড়িয়ে পড়ে ইত্যাদি ভাবে এ-ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

ঘ. **বিদ্ধ ক্ষত :** এ-ধরনের ক্ষতের মুখ ছোট কিন্তু বেশ গভীর হয়। সুচ, পেরেক, ছুরি, তীর, ব্যায়নেট ইত্যাদি সুচালো যন্ত্রের আঘাতে বিদ্ধ ক্ষতের সৃষ্টি করে।

গুলির আঘাতে এ-ধরনের ক্ষত ছাড়াও উল্লিখিত সকল প্রকার ক্ষতই সৃষ্টি হতে পারে।

রক্ত

মানবদেহে রক্তের প্রয়োজন সর্বাধিক। আধুনিক প্রযুক্তিতে অনেক কিছুর বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও অদ্যাবধি রক্তের কোনো বিকল্প বের করা সম্ভব হয়নি। দেহের

কোথাও কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে তার থেকে রক্ত দেহের বাইরে চলে আসে। দেহ থেকে অধিক পরিমাণে রক্ত বের হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তাই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে সর্বাগ্রে রক্তপাত বন্ধের উদ্যোগ নিতে হয়।

ধমনী বা শিরা অথবা উভয়ই ছিঁড়ে গেলে বা কেটে গেলে রক্তক্ষরণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

স্কাউট ভাইয়েরা, একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে যতগুলো রোগীর সেবার সুযোগ তোমাদের আসবে, দেখবে তার মধ্যে ক্ষত ও রক্তক্ষরণের রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দৈনন্দিন গৃহকর্ম ও চলাফেরার সময় সামান্য অসাবধানতার দুর্ঘটনা তো আমাদের নিত্যদিনের সাথী।

তুমি যখনই কোনো প্রকার ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চাইবে তখন তোমাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবশ্যই সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে– ১. রক্তক্ষরণের প্রকাভেদ, ২. রক্তের প্রকাভেদ, ৩. ক্ষত দূষণ ও পচনরোধ, ৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি।

রক্তক্ষরণ

মানবদেহ থেকে দুইভাবে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে– ১. বাহ্যিক ২. অভ্যন্তরীণ

১. বাহ্যিক : দেহতন্তুতে কোনোভাবে কোনো ক্ষত হলে যখন রক্ত বের হতে দেখা যায় তখন তাকে বাহ্যিক রক্তক্ষরণ বলে। কেটে গেলে বা মিশ্র অস্থিভঙ্গ হলে অথবা অন্য কোনোভাবে আহত হয়ে ক্ষত হলে এরূপ রক্তক্ষরণ হয়।

২. অভ্যন্তরীণ : অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ চামড়ার নিচে হয়ে থাকে। যা দেখা যায় না বা বের হয়ে আসে না।

কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে তার থেকে তিন প্রকারের রক্ত বাহির হয়।

ক. ধমনীর রক্ত বা আর্টারিয়াল ব্লাড, খ. শিরার রক্ত বা ভেনাস ব্লাড, গ. কৈশিক নাড়ীর রক্ত বা ক্যাপিলারিয়াস ব্লাড।

ধমনীর রক্ত বা আর্টারিয়াল ব্লাড

- ধমনী থেকে যে রক্ত বের হয় তার রঙ হয় টকটকে বা উজ্জ্বল লাল।

- আহত ধমনী ত্বকের ঠিক নিচে বলেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের তালে তালে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে।
- ক্ষতের যে পাশটি হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী ঠিক সেই দিক থেকে রক্ত বের হতে থাকে।

শিরার রক্ত বা ভেনাস ব্লাড

- শিরার রক্তের বর্ণ হয় ঈষৎ কালচে, যাকে আমরা গাঢ় লাল বর্ণ বলে থাকি।
- একটানা স্রোত ধারার ন্যায় অর্থাৎ অবিরাম ধারায় রক্ত বের হয়ে আসে কিন্তু তার গতি বেশ মন্থর।
- ক্ষতের যে পাশটি হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে সেই পাশ থেকে রক্ত বের হতে থাকে।

কৈশিক নাড়ীর রক্ত বা ক্যাপিলারিয়াস ব্লাড

- রক্তের রঙ ঈষৎ হালকা হয় যাকে আমরা সাধারণ লাল বর্ণ বলে থাকি।
- ধীরে ধীরে একটানা স্রোতের ন্যায় বের হয়ে আসে বা সম্পূর্ণ আহত স্থান চুইয়ে আসে।

উল্লেখ্য যে, ধমনী এবং শিরা উভয়ই একসাথে আহত হলে অবিরাম ধারায় রক্ত বের হতে থাকে।

পচন বা জীবদূষণ

ক্ষতস্থানের আগত তন্তু রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অস্বাভাবিক আকার ধারণ করাকে জীবদূষণ বলা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মাটি, পানি, বাতাস সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর এ-কারণেই মানুষের দেহ বা পশু ও বংশ বৃদ্ধির জন্য আর্দ্র পরিবেশ প্রয়োজনীয় খাদ্য ও উপযুক্ত তাপের প্রয়োজন হয়। আর এর সবকটিই তারা মানবদেহের আহত তন্তুতে (ক্ষতে) পেয়ে থাকে। ক্ষতে প্রবেশ করে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে তারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং কোষগুলোকে আক্রমণ করে। ফলে ক্ষত স্থান ফুলে যায় ও লাল বর্ণ ধারণ করে এবং দূষিত ক্ষতে পরিণত হয়। মৃত তন্তু কোষ, শ্বেত কণিকা ও জীবাণু এইসব মিলে ক্ষত স্থানে পুঁজের সৃষ্টি হয়।

এই পচন রোধের জন্য পরিচ্ছন্নতা সর্বাধিক প্রয়োজন। সে-জন্য ক্ষত-স্থানের সংস্পর্শে যা কিছু আসবে তা অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ড্রেসিং-এর আগে ভাল করে হাত ও হাতের নখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। ক্ষত স্থানে পানি দেয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই তা প্রায় ২০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে ঐ পানি ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় পানিই জীবাণু বাহকের কাজ করবে।

পচন রোধক

পচন রোধক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য যার জীবাণু নাশের ক্ষমতা আছে। যেমন– ডেটল, সেভলন, সেপনিল ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে ক্ষতস্থান ও তার চারপাশ পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের ক্ষত এবং রক্তের সাথে তোমাদের পরিচয় হয়েছে। ক্ষত থেকে যে রক্তপাত হয় তা কী করে বন্ধ করা যায় সে সম্পর্কে এখনো তোমরা জানতে পারনি। এসো রক্তক্ষরণ বন্ধের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

ক্ষত ও রক্তক্ষরণের চিকিৎসার সাধারণ নিয়ম

ক. রোগীকে বসান বা শোয়ান যায় এমন স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। কারণ রোগীকে বসান বা শোয়ান হলে রক্তক্ষরণ কমে যায়।

খ. যেখান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে সে অংশ উঁচু করে তুলে ধরতে পারলে রক্ত ক্ষরণ অনেক কম হবে। অস্থিভঙ্গ হলে তা করা যাবে না।

গ. যতখানি সম্ভব ক্ষত স্থানের কাপড় সরিয়ে খুলে রাখতে হবে।

ঘ. ক্ষত স্থানের জমাট বাঁধা রক্ত উঠিয়ে ফেলা যাবে না কারণ এতে রক্ত ক্ষরণ রোধ এবং রোগজীবাণু প্রবেশের হাত থেকে ক্ষতস্থান রক্ষা পায়।

ঙ. ধুলাবালি বা বাইরের অন্য কিছু লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এ-কাজে ড্রেসিং বা পাতলা পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে হবে।

চ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামান্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

ছ. ড্রেসিং প্যাড ও ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে হবে।

জ. আহত অঙ্গ নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে। সন্ধিস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হলে প্রয়োজনে স্প্লিন্ট ব্যবহার করতে হবে।

রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগ পদ্ধতি

১. ক্ষতস্থানের যেখান হতে রক্ত বের হচ্ছে সেখানে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতে হবে। কিন্তু ক্ষত স্থানে যদি বাইরের কোনো কিছু লেগে থাকে যা বের করা যাচ্ছে না বা সেখানের অস্থিভঙ্গ হয়ে থাকলে তখন ঠিক তাতে চাপ প্রয়োগ না করে তার পার্শ্বে চাপ দিতে হবে। আর যদি ক্ষতস্থানের কোন পাশ থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে তা না বোঝা যায় তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষতস্থান চেপে ধরতে হবে। এতে ক্ষরণ কমে আসবে যা ড্রেসিং-এর কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

২. (ক) যখন ক্ষতস্থানে বাইরের কোনো বস্তু না থাকে বা অস্থিভঙ্গ না হয় তখন ক্ষতস্থান প্রয়োজন মত ড্রেসিং ও প্যাড দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। আবার এই ক্ষত গভীর হলে পুরু করে প্যাড ব্যবহার করতে হয়, যাতে রক্তনালীগুলোর ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে।

(খ) ক্ষতস্থান থেকে বাইরের বস্তু বের না করা গেলে বা অস্থিভঙ্গ হলে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন সেখানে কোনরূপ চাপ না পড়ে এবং সেখানে চারপাশে ক্ষত স্থান থেকে একটু দূরে প্যাড দিতে হবে ও প্যাডের ওপর শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। এ-ক্ষেত্রে সব সময় ভালভাবে লক্ষ রাখতে হবে যেন কোনোক্রমে ক্ষতস্থানে চাপ না পড়ে। মাথার খুলিতে ক্ষত হলে এবং তাতে বাইরের কিছু থাকলে বা অস্থিভঙ্গ হলে সেখানে রিংপ্যাড ব্যবহার করতে হবে। রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা ঠিক নয় এবং সেভাবেই পরিমিত পরিমাণে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। তাতেও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তবে পূর্বের ব্যান্ডেজের ওপর আর একটি প্যাড দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। এ-ক্ষেত্রে মূল প্যাড খোলা যাবে না।

পরোক্ষ চাপের সাহায্যে রক্তক্ষরণ রোধ

রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য মানবদেহের যে সকল স্থানে ধমনী শিরা ঠিক তার নিচের হাড়ের সাথে চেপে ধরা যায় তাকে "প্রেসার পয়েন্ট" বলে।

মানবদেহে মোট ১৩টি প্রেসার পয়েন্ট রয়েছে। ডান এবং বাম উভয় পাশে একই জায়গায় এই প্রেসার পয়েন্ট পরিলক্ষিত হয়।

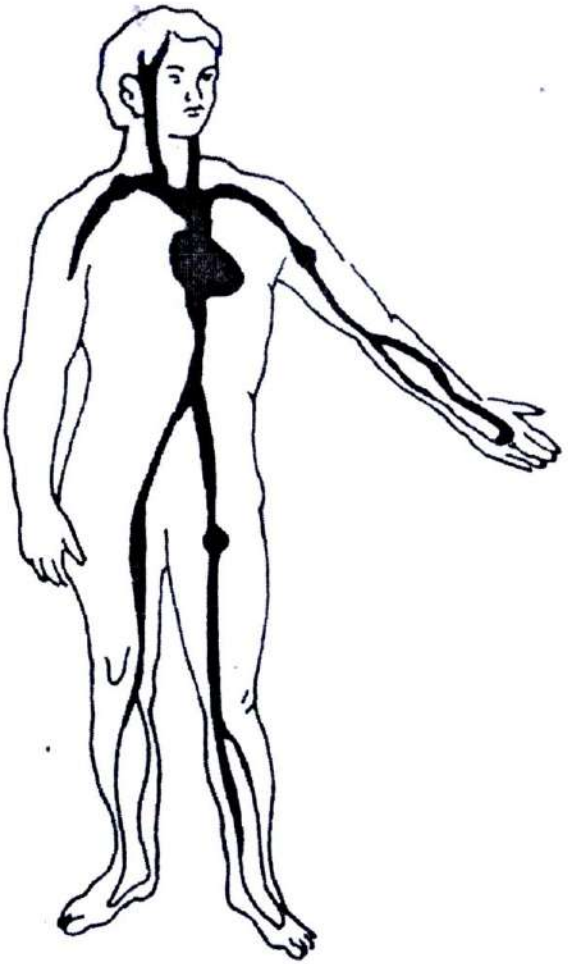

১. **কেরোটিড আর্টারি :** কেরোটিড আর্টারির উর্ধ্বাংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য এই প্রেসার পয়েন্টে চাপ প্রয়োগ করতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ঘাড়ের পেছনের মেরুদন্ডের দিকে এমনভাবে চাপ দিবে যেন শ্বাসনালীতে চাপ না পড়ে। অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ক্ষত স্থানে চাপ দাও, এতে আহত কেরোটিড আর্টারির সাথে আহত প্রধান শিরা (ডগুলার ভেন) থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধে সাহায্য করবে, সেই সাথে কেরোটিড আর্টারির রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে।

ডাক্তারের সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত চাপ ছাড়া যাবে না। প্রয়োজনবোধে এ-কাজে অন্যের সাহায্য নিতে হবে। কারণ এ-ধরনের ক্ষতে প্রবল রক্তক্ষরণ হয় যা খুবই মারাত্মক।

২. **ফেশিয়াল আর্টারি :** চিবুক, ঠোঁট, গলা ও নাকের বাইরের দিকে চোখের নিচের অংশ অর্থাৎ মুখমন্ডলের যে-কোনো জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে এই প্রেসার পয়েন্টে চাপ প্রয়োগ করতে হয়। চোয়ালের কোণে সামনের দিকে প্রায় দুই আঙ্গুল পরিমাণ যে খাঁজ আছে সেটাই ফেশিয়াল প্রেসার পয়েন্টের স্থান।

পদ্ধতি : গালের বাইরের দিক দিয়ে চোয়ালের হাড়ের ওপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দাও। ঠোঁট বা গালের রক্ত বন্ধের ক্ষেত্রে এমনভাবে চেপে ধর যেন বৃদ্ধাঙ্গুল মুখের বাইরে এবং অপর আঙ্গুল মুখের ভিতর দিকে থাকে, প্রয়োজনে এর বিপরীত দিকেও ধরা যেতে পারে।

৩. **টেম্পোরাল আর্টারি :** কানের উপরের অংশের সম্মুখভাগে অর্থাৎ চীপে এর অবস্থান। রগ থেকে রক্তক্ষরণ হলে এই প্রেসার পয়েন্টে চাপ প্রয়োগ করতে হয়।

৪ **অক্সিপিটাল আর্টারি :** কান থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ পেছনে মাথার খুলি ও ঘাড়ের সন্ধিস্থলে এর অবস্থান। কানের পিছন দিকে এবং মাথার পিছন দিকে রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে এই প্রেসার পয়েন্ট অনেক সময় চিহ্নিত করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষত স্থানের ঠিক নিচে চাপ দিলেই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

মাথার খুলিতে রক্তপাত বন্ধের ক্ষেত্রে ক্ষত স্থানে প্রথমে প্যাড দাও। তারপর একটি ব্যান্ডেজ নিয়ে ব্যান্ডেজের মধ্যখান প্যাডের ওপর স্থাপন কর এবং প্রান্তদ্বয় সুবিধামত ঘুরিয়ে নিয়ে প্রান্তের মাথায় শক্ত করে রিফনট বাঁধ যেন নটটি প্যাডের ওপর থাকে।

মাথায় যে-কোনো অংশে অস্থিভংগ হলে বা বাইরের কোনো কিছু থাকলে অবশ্যই তাতে রিংপ্যাড ব্যবহার করতে হবে।

৫. **সাবক্লেভিয়ান আর্টারি :** কণ্ঠাস্থির সাথে ভিতরের দিকে পেশীদ্বয়ের মধ্যবর্তী গর্তের মত স্থানে এর অবস্থান।

পদ্ধতি

ক. গলা ও বুকের উপরের অংশে কাপড় থাকলে তা খুলে ফেল।

খ. রোগীর বাহু তার শরীরের সাথে এমনভাবে চেপে ধর যেন কাঁধ নুইয়ে পড়ে এবং তার মাথা আহত দিকে কাত করতে বল।

গ. রোগীর কাঁধের দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

ঘ. ডান আর্টারি আহত হলে তোমার বাম হাত আর বাম আর্টারি আহত হলে তোমার ডান হাত দিয়ে রোগীর ঘাড়ে এমনভাবে ধর যেন বৃদ্ধাঙ্গুল প্রেসার পয়েন্টে এবং অপর আঙ্গুল কাঁধের পেছনে থাকে।

ঙ. বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ধমনীর প্রথম পাজরাস্থির সাথে চেপে ধর। কণ্ঠাস্থির ঠিক নিচেই প্রথম পাজরাস্থির অবস্থান।

৬. **এক্সিলারী আর্টারি :** সাবক্লোভিয়ান আর্টারির সম্প্রসারণ অংশই হলো এক্সিলারী আর্টারি। কাঁধের সন্ধিস্থলের খুব কাছেই এর অবস্থান। বগলে একটু ভাল করে চাপ দিলেই এর স্পন্দন বোঝা যাবে। এ-ক্ষেত্রে আঙ্গুলের চাপে তেমন ফল পাওয়া যায় না। প্যাড ও ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে বেশ ফল পাওয়া যায়।

পদ্ধতি

ক. ছোট বলের মত করে একটি প্যাড তৈরি করে প্রেসার পয়েন্টে রাখ।

খ. একটা সরু ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ প্যাডের ওপর রাখ। এবার ব্যান্ডেজের দুই প্রান্ত বিপরীত দিক দিয়ে কাঁধের ওপর নিয়ে শক্ত করে ধর এবং ঘাড়ের দুই পাশ দিয়ে অপর বগলের নিচে শক্ত করে বাঁধ। লক্ষ রাখতে হবে যেন প্যাড যথাস্থানে থাকে।

গ. যে বগলে প্যাড ব্যবহার করা হয়েছে সেই হাতের নিম্নবাহু এক সমকোণ রেখে একটি চওড়া ব্যান্ডেজ দিয়ে দেহের সাথে শক্ত করে বেঁধে দাও।

৭। **ব্রেকিয়েল আর্টারি :** বগল হতে কনুই পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বাইসেপস মাংসপেশীর ভেতরের পাশ দিয়ে এটি ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে আঙ্গুলের চাপ বা টুরনিকেট বেঁধে অনায়াসে রক্ত বন্ধ করা যায়।

পদ্ধতি : পেছন দিক থেকে উর্ধ্ববাহুর নিচে জড়িয়ে উর্ধ্ব বাহুর মাঝ বরাবর বাহুর হাড়ের সাথে শিরাটিকে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধর।

৮. **রেডিয়েল আর্টারি :** কনুইয়ের ঠিক নিচে রেডিয়েল আর্টারি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর যেভাগ নিম্নবাহুর সামনে দিয়ে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে একেই রেডিয়েল আর্টারি বলে। হাতের কব্জির এক ইঞ্চি উপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর পাশ থেকে আধা ইঞ্চি ভিতর দিয়ে এই প্রেসার পয়েন্টের অবস্থান।

৯. **আলনার আর্টারি :** কনুই এর ঠিক নিচে ব্রেফিয়েল আর্টারি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যেভাগ ভিতর দিয়ে এসে বিস্তৃতি লাভ করেছে তাকে আলনার আর্টারি বলে। কব্জি থেকে ১ ইঞ্চি উপরে এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল বরাবরে পাশ থেকে ১ ইঞ্চি ভেতর দিকে এর অবস্থান।

রেডিয়েল এবং আলনার আর্টারি দুটি আর্টারি যুক্ত হয়ে করতালে ''পামার আর্চ''-এ পরিণত হয়েছে। এর শাখা-প্রশাখা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

পদ্ধতি : রেডিয়েল বা আলনার আর্টারিতে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগ করা যায়।

১০. ফিমোরেল আর্টারি : ফিমোরেল আর্টারি থেকেই ইলিয়াক আর্টারির বিস্তার। উরুসন্ধির ভাঁজের মধ্যভাগ দিয়ে উরুতে প্রবেশ করেছে। এখানে ত্বকের নিচেই এর স্পন্দন অনুভব করা যায়।

পদ্ধতি

ক. রোগীকে চিৎ করে শোয়াও এবং তার হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে দাও।

খ. রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বস।

গ. তোমার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে প্রেসার পয়েন্ট স্পর্শ কর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলের ওপর অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল রাখ এবং সম্মিলিতভাবে চাপ দাও। সেই সাথে অপর আঙ্গুলগুলি দিয়ে দুই পাশের উরুচেপে ধর।

ঘ. বস্তিদেশের কিনারের দিকে চাপ দাও।

উরুসন্ধি বা কুচকি থেকে হাঁটুর মোট অংশের উপরের যে (১,৩) অংশ থেকে রক্ত বন্ধের জন্য এই প্রেসার পয়েন্টে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এ-ক্ষেত্রে কোনো টুরনিকেট বাঁধা যায় না, প্রয়োজন বোধে অন্যের সাহায্য নিয়ে চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

১১. **পপলিটিয়াল আর্টারি :** জানুসন্ধির ঠিক পেছনের দিকে এর অবস্থান। পপলিটিয়াল আর্টারি পস্টিরিয়াল আর্টারি এবং এন্টিরিয়াল টিবিয়াল আর্টারি নামে দুই ভাগে ভাগ হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

১২. **পস্টিরিয়াল টিবিয়াল আর্টারি :** পায়ের পেছন দিয়ে গুল্‌ফ সন্ধির ভিতর পর্যন্ত ক্রমে নিচের দিকে নেমে গেছে। পায়ের গাইট ও গোড়ালির মাঝখানে এর স্পন্দন অনুভব করা যায়। এটি পায়ের নিচে প্লাটার আর্টারি নামে মাংসপেশীর মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে থাকে।

১৩. **এন্টিলিয়াল টিবিয়াল আর্টারি :** পপলিটিয়াল আর্টারি থেকে পায়ের সামনের অস্থিদ্বয়ের মধ্য দিয়ে মাংসপেশীর ভেতর হয়ে নিচের দিকে পায়ের কব্জির সামনের অংশের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে গেছে।

স্কাউট ভায়েরা, প্রেসার পয়েন্টগুলির সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই শুধু এখানে সবকটি প্রেসার পয়েন্টের আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয় তোমাদের ভাল করে খেয়াল রাখতে হবে যে, যেখানে দুটি হাড় রয়েছে সেখানে টুরনিকেট বাঁধলে কার্যকর তো হয়ই না এবং রক্তপাত বৃদ্ধি পায়। যেমন– অগ্রবাহু এবং হাঁটুর নিম্নাংশ। সুতরাং এই অংশে কখনই চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রক্ত বন্ধ করতে যাবে না।

বিশেষ ধরনের ক্ষত

ক) যদি অভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্র বের হয়ে না আসে সে-ক্ষেত্রে–

১. রোগীকে চিৎ করে হাঁটু ভাঁজ করে শোয়াতে হবে এবং মাথা ও কাঁধ উঁচু করে রাখতে হবে।

২. ক্ষতের চিকিৎসার সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করবে।

৩. মুখ দিয়ে কোনো কিছু খেতে দেবে না।

খ) যদি অভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্র (নাড়িভুড়ি) বের হয়ে আসে সে-ক্ষেত্রে–

১. রোগীকে চিৎ করে হাঁটু ভাঁজ করে শোয়াও এবং তার মাথা ও কাঁধ উঁচু করে রাখ।

২. বেরিয়ে আসা শরীরযন্ত্র মোটেও ভিতরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করবে না। এ-ক্ষেত্রে লিন্ট বা পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে।

৩. রোগীকে উত্তপ্ত রাখার চেষ্টা করবে। লক্ষ রাখবে যেন কোনো প্রকারে পেটে চাপ না পড়ে।

৪. মুখ দিয়ে কোনো কিছু খেতে দেবে না।

৫. যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করবে।

গ) বুকে গভীর ক্ষত হলে

বুকে গভীর ক্ষত হলে বাইরের বাতার বুকের ভেতরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করেও বের হয়ে আসে। এটা অত্যন্ত গুরুতর অবস্থা এ-ক্ষেত্রে ড্রেসিং ও প্যাড দিয়ে ক্ষত স্থান শক্ত করে চেপে বাঁধ এবং দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর কর।

২. অভ্যন্তরীণ

অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ আবার দুই প্রকার

ক) প্রকাশিত।

খ) অপ্রকাশিত।

ক) **প্রকাশিত :** ফুসফুস, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, মূত্রগ্রন্থি, অন্ত্রের উর্ধ্বাংশ ও অন্ত্রের নিম্নাংশ ইত্যাদি হতে যে রক্তক্ষরণ হয় তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় বা প্রকাশ পায় যেমন– (১) ফুসফুস হতে যখন রক্তক্ষরণ হয় তখন তা কাশির সাথে বাইরে আসে। দেখতে তা উজ্জ্বল লাল বর্ণের দেখায় (২) যখন পাকস্থলী থেকে বমির সাথে বের হয়ে আসে তখন তা দেখতে কিছুটা কালচে বর্ণের হয় এবং স্থানে স্থানে অবস্থান করে কিছুটা কফির গুঁড়ার মত দেখায় (৩) মূত্রাশয় থেকে প্রস্রাবের সাথে রক্ত মিশ্রিত হতে পারে, প্রস্রাবে কষ্ট হয়। (৪) মূত্রগ্রন্থি হতে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে আসে এ-ক্ষেত্রে রঙ ফিকে লাল বর্ণের হয়। (৫) অন্ত্রের উর্ধ্বাংশ হতে যখন রক্তক্ষরণ হয় তখন ঐ রক্ত দেখতে আলকাতরার মতো কালো দেখায়। (৬) অন্ত্রের নিম্নাংশ হতে যখন রক্তক্ষরণ হয় তখন তা স্বাভাবিক রক্তের মতই দেখায়।

(খ) **অপ্রকাশিত :** অস্থিভঙ্গ হলে, বিশেষ করে উরুর অস্থিভঙ্গ হলে ২০-৩০ ভাগ রক্ত নষ্ট হয়। পদভঙ্গের ক্ষেত্রে টিবিয়া ও ফিবিউলা ভঙ্গ হলে ১৫-২০ ভাগ রক্ত নষ্ট হয়। আবার বাহু আঘাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানের রক্ত নষ্ট হতে থাকে।

অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের লক্ষণ ও প্রতিবিধান

লক্ষণ

১। রোগী দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। দাঁড়ালে মাথা ঘুরবে এমনকি অজ্ঞান হতে পারে।

২। মুখ ও ঠোঁট ফ্যাকাশে দেখাবে।

৩। ত্বকে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে এবং বিবর্ণ দেখাবে।

৪। রোগী তৃষ্ণা বোধ করবে।

৫। অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। রোগী উত্তেজিত হয়ে বেশি কথা বলার চেষ্টা করতে পারে।

৬। নাড়ীর স্পন্দন ক্ষীণ এবং দ্রুত হবে। এ-ক্ষেত্রে কখনো কখনো স্পন্দন অনুভব করা খুবই কষ্টকর হতে পারে।

৭। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টকর হবে। মাঝে মাঝে হাই তুলবে এবং দীর্ঘ শ্বাস ফেলবে।

৮। হাত পা ছেড়ে, কাপড়-চোপড় ধরে টানাটানি করে বাতাসের জন্য ব্যাকুল হবে।

৯। অচৈতন্য অবস্থা দেখা দেবে।

এই লক্ষণগুলি স্নায়ুবিক আঘাতের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কিন্তু বাতাসের জন্য ব্যাকুলতা, অত্যধিক পিপাসা ও অস্থিরতা ইত্যাদি থেকে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

প্রতিবিধান

১. রোগীকে মুখে কিছু খেতে দেবে না।

২. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর।

গণ্ডদেশ, জিহবা, মাড়ি ও দাঁতের গর্ত থেকে রক্তক্ষরণ

গণ্ডদেশের সম্মুখ ভাগ বা জিহবা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে তাহলে একখণ্ড পরিষ্কার লিন্ট বা তুলা নিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করাও তারপর আরও কিছু তুলা নিয়ে তার ওপর স্থাপন কর এবং রোগীকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতে বল। অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে।

দাঁতের গর্ত বা গোড়া থেকে যদি রক্তক্ষরণ হতে তাকে তাহলে একখণ্ড পরিষ্কার লিন্ট বা তুলা নিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করাও তারপর আরও কিছু তুলা নিয়ে তার ওপর স্থাপন কর এবং রোগীকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতে বল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

নাক থেকে রক্তক্ষরণ

(১) খোলা জায়গায় রোগীকে বসাও। যদি ঘরে হয়ে থাকে তবে জানালা খুলে দাও। যেদিক থেকে বাতাস আসছে সেদিকে মুখ করে বসাও এবং রোগীর মাথা সামনের দিকে নত করে রাখ।

(২) ঘাড় ও বুকের কাপড় থাকলে তা খুলে ফেল অথবা ঢিলা কর।

(৩) রোগীকে মুখ খুলে রাখতে বল এবং নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিষেধ কর।

(৪) নাকের শক্ত অংশের নিচে জোরে চেপে ধর। কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবে নাক যেন বন্ধ না হয়।

(৫) রোগীকে কখনই নাক ঝাড়তে দেবে না।

কানের ভিতর থেকে রক্তক্ষরণ

(১) রোগীর মাথা সামান্য উঁচু রেখে চিৎ করে শোয়াও।

(২) কানের ছিদ্র পথ মোটেও বন্ধ করবে না।

(৩) আহত কানের দিকে মাথা সামান্য হেলিয়ে রেখে কানের ওপর একটি শুষ্ক ড্রেসিং দিয়ে আলগাভাবে ব্যান্ডেজ কর।

করতল হতে রক্তক্ষরণ

করতলে কয়েকটি ধমনী পরস্পর যুক্ত হয় বলে করতলে রক্তক্ষরণ তীব্র আকার ধারণ করে। ক্ষতে যদি কোনো বাইরের জিনিস না থাকে তবে ড্রেসিং ও ছোট

প্যাড আহত ব্যক্তির আঙ্গুল বাঁকিয়ে প্রত্যক্ষ চাপ দিতে হবে এবং নিম্নের পদ্ধতিতে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে (প্যাডটি ছোট ও শক্ত হতে হবে। এ-ক্ষেত্রে ২ ইঞ্চি সাইজের রোলার ব্যান্ডেজ প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে)।

করতলে ড্রেসিং-এর ওপর প্যাডটি বসাও এবং আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করে দাও। কব্জির পেছনের দিকে সরাসরি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ এমনভাবে স্থাপন কর যেন ব্যান্ডেজের মধ্যবর্তী অংশটি ক্ষতস্থানের উপরে থাকে। বুড়ো আংগুলের একটি প্রান্ত আন এবং মুষ্টির উপর দিয়ে তির্যকভাবে জড়িয়ে কব্জির পেছন দিকে নিয়ে পুনরায় বুড়ো আংগুলের দিকে আন। এবার অপর প্রান্তটি পুনরায় তির্যকভাবে জড়িয়ে কব্জির সামনের দিকে আন। অবশেষে কব্জির পেছনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রিফনট দাও।

এবার একটি ত্রিকোণ স্লিং দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

স্ফীত শিরা থেকে রক্তক্ষরণ

পায়ে সাধারণত এরূপ স্ফীত শিরা দেখা যায়। যখন পায়ের শিরার ভাল্বসমূহ ঠিকভাবে কাজ করে না তখন সেগুলো ফুলে যায়। এগুলোর পেছনের দিকে রক্তে চাপ দিতে থাকে এবং শিরাগুলি বেড়ে উঠে একটি রক্তের আধারে পরিণত হয়।

এরকম স্ফীত শিরা ফেটে যে রক্তক্ষরণ হয় তা খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ-ক্ষেত্রে তীব্র রক্তক্ষরণ হয়, যা বন্ধ করতে না পারলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

প্রতিবিধান

১. রোগীকে চিৎ করে শোয়াও এবং আহত স্থান যথাসম্ভব উঁচু করে রাখ।

২. রক্তক্ষরণের স্থানে একটি পরিষ্কার প্যাড দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও।

৩. পায়ে অন্য কিছু শক্ত করে বাঁধা থাকলে তা আলগা করে দাও যেন সহজে রক্ত সঞ্চালন হতে পারে।

কাল শিরা

দেহের কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে কখনো কখনো ত্বক বিচ্ছিন্ন না হয়ে ত্বকের নিচের কৈশিক নাড়ী দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আহত স্থানটি ফুলে তার রঙ পরিবর্তিত হয়।

এ-ক্ষেত্রে কিছু স্পিরিট এর সঙ্গে সমপরিমাণে পানি মিশিয়ে তাতে একটি লিন্ট ভিজিয়ে আহত স্থানের ওপর পট্টির মত বেঁধে দিতে হবে। চোখে এরূপ হলে এ-ক্ষেত্রে স্পিরিট না দিয়ে কেবলমাত্র পানির পট্টিই ব্যবহার করতে হবে।

অধ্যায় : পাঁচ

স্নায়ুবিক আঘাত

গুরুত্বপূর্ণ দেহ যন্ত্র ক্রিয়া দারুণভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে স্নায়ুবিক আঘাত বা Shock বলে। স্নায়ুবিক আঘাতের সাথে সাথে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। আঘাতের পরিমাণ ও আঘাতের ধরনের সাথে স্নায়ুবিক আঘাত ও এর তারতম্য দেখা যায়। গুরুতর আঘাতজনিত শক-এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

স্নায়ুবিক আঘাত সাথে সাথে সৃষ্টি হতে পারে আবার ধীরে ধীরেও প্রকাশ পেতে থাকে। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, স্নায়ুবিক আঘাতের লক্ষণ সব সময় প্রকাশ পায় তা নয় কখনো কখনো তা বোঝাই যায় না। পরিমাণের অধিক রক্ত বা রক্ত রস বের হয়ে গেলে স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দেবে। গুরুতর আঘাতের ফলে ভীষণভাবে স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক রক্তক্ষরণ উভয় ক্ষেত্রেই স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দেয়। রক্তক্ষরণের পরিমাণ ও দ্রুততার ওপর শকের তীব্রতা নির্ভরশীল। রক্তক্ষরণ হলে তা বন্ধ করা ও রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক করার মাধ্যমে শকের সাধারণ প্রতিবিধান করে রোগীকে সুস্থ করার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু রক্তক্ষরণ বন্ধ করা না গেলে এবং পরিমাণের চেয়ে বেশি রক্ত বের হয়ে গেলে সে-ক্ষেত্রে শরীরে রক্ত প্রবেশ করাতে হবে। আর তা না করা পর্যন্ত রোগীর অবস্থা আশংকাজনক হয়ে উঠবে। এ-কাজের জন্য রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্নায়ুবিক আঘাতের লক্ষণ

১. আচ্ছন্ন ও মূর্ছাভাব

২. শীত শীত ভাব

৩. বিবর্ণতা

৪. বমি বমি ভাব

৫. ত্বক ঠাণ্ডা ও পাণ্ডুর

৬. নাড়ীর গতি প্রথমে ক্ষীণ এবং ক্রমে দ্রুত হয়

৭. অচৈতন্য অবস্থা

স্নায়ুবিক আঘাতের ধরন

স্নায়ুবিক আঘাত দুই ধরনের হয় (১) সাধারণ স্নায়ুজনিত আঘাত (২) প্রতিষ্ঠিত স্নায়ুবিক আঘাত

১. সাধারণ স্নায়ুবিক আঘাতের ধরন

সব ধরনের স্নায়ুবিক আঘাতেই কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া থাকে। এতে রক্তচাপ হঠাৎ করে কমে যায়। ফলে মাথার পরিমিত পরিমাণ রক্তের অভাব দেখা দেয়।

২. প্রতিষ্ঠিত স্নায়ুবিক আঘাত

বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হলে যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই প্রতিষ্ঠিত স্নায়ুবিক আঘাত বলা যেতে পারে। বড় ধরনের পর এরূপ হওয়া সম্ভাবনা থাকে। আঘাত বা ক্ষত গভীর হলে এবং রক্তক্ষরণ অপ্রকাশিত থাকলে রোগীর অবস্থা বিপদজ্জনক হয়ে থাকে।

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যাহত হলে স্নায়ুবিক আঘাত বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত আঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এতে রোগীর গায়ের রঙ ধূসর বর্ণের হবে। এই অবস্থা খুবই বিপজ্জনক, এতে নাড়ীর স্পন্দনও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসবে।

স্নায়ুবিক আঘাতের সাধারণ চিকিৎসা

১. রোগীকে উৎসাহ দিতে হবে।

২. মাথা, বুক ও পেটে আঘাত না লেগে থাকলে রোগীকে পাশ ফিরে শোয়া এবং মাথা ও কাঁধ উঁচু করে রাখ। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করলে বা বমি করলে তাকে ঐ অবস্থা থেকে কিছুটা উপুড় করে শোয়াও।

৩. গলা, বুক ও কোমরের কাপড় আলগা করে দাও।

৪. কম্বল দিয়ে তাকে মুড়ে দাও।

৫. তৃষ্ণা বোধ করলে পানি, চা, কফি ধীরে ধীরে পান করতে দাও। লক্ষ রাখবে সে যেন কোনো মাদক পানীয় পান করতে না পারে।

৬. দেহের কোন অংগে আলাদা কোনো তাপ প্রয়োগ করতে দেবে না বা নড়াচড়া করবে না।

প্রতিষ্ঠিত আঘাতের বিশেষ চিকিৎসা

স্নায়ুবিক আঘাতের বিশেষ চিকিৎসা প্রণালিতে যেভাবে বলা হয়েছে তা অনুসরণ করবে এবং সেই সাথে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যে গুরুতর আঘাতে রোগীর জীবন রক্ষার জন্য যদি রক্ত দেয়া বা অপারেশনের প্রয়োজন হয়, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১) রোগীকে কোনো কিছু খেতে দেবে না।

২) স্ট্রেচারে এমনভাবে শোয়াবে যেন দেহের নিম্নাংশের চেয়ে মাথা কিছুটা নিচে থাকে।

স্কাউট ভাইয়েরা, এ পর্যন্ত প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে তোমাদের সাথে যতটুকু আলোচনা করেছি তা থেকে তোমরা যে ধারণা লাভ করেছ তাতে একজন বিপদগ্রস্ত রোগীর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারবে।

আলোচনার গোড়াতেই তোমাদের যে বিষয়ে আলোকপাত করছি তাতে সর্বাগ্রে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক, না কোন বিঘ্ন ঘটেছে তা বুঝতে হলে এ সম্পর্কে তোমাদের কিছুটা ধারণা থাকতে হবে।

চল এবার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কতগুলো অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালি

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালি হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা দেহের প্রতিটি টিস্যু বা তন্তু ও যন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ অক্সিজেন পায় এবং বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড

পরিত্যাগ করে। দেহের তন্তু বা যন্ত্রগুলো অক্সিজেন পায় রক্ত থেকে। রক্ত অক্সিজেন পায় ফুসফুসের কাছ থেকে এবং ফুসফুস অক্সিজেন পায় নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণকৃত বিশুদ্ধ বাতাস থেকে।

ফুসফুসের শ্বাস প্রক্রিয়া দু'ভাবে হয়ে থাকে–

১. নিঃশ্বাস গ্রহণ (Inspiration)
২. প্রশ্বাস ত্যাগ (Expiration)

শ্বাসক্রিয়ার কাজ হলো–

১. দেহের অক্সিজেন সরবরাহ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ।
২. অপ্রয়োজনীয় তেল, পানি, অ্যালকোহল প্রভৃতি শরীর থেকে বের করে দেয়া।
৩. রক্তের জলীয় অংশের সমতা রক্ষা করা।
৪. দেহে তাপের সমতা রক্ষা করা।

একজন সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রতি মিনিটে ১৮-২০ বার শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করে থাকে। শিশুরা মিনিটে ২৫-৩০ বার এবং বৃদ্ধরা ৪-১৮ বার শ্বাস ক্রিয়া করে। শ্বাস ক্রিয়া বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। তবে ঘুম বা পরিশ্রমের সময় এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

প্রতিবার শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে একজন সুস্থ্য ব্যক্তির নাড়ি ৪ বার চলে।

অর্থাৎ শ্বাস ও রক্ত চলাচলের অনুপাত হচ্ছে ৪:১।

মস্তিষ্কের সম্মুখ দিকের নিম্নভাগে একটি শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্র (Wind Centre) রয়েছে। এই কেন্দ্রটিই দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও উত্তেজনার কারণে এই কেন্দ্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং শ্বাস ক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী প্রধান কাজ হবে রোগীকে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ-ক্ষেত্রে দ্রুত এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে রোগীর জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এস্‌ফিক্‌সিয়া (Asphyxia)

ফুসফুসে যখন পরিমিত বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব ঘটে এবং এর ফলে দেহ যন্ত্র ও মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রগুলো অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়। এরূপ বঞ্চিত অবস্থাকেই

এস্‌ফিক্‌সিয়া বা শ্বাসরোধ বলে। শ্বাসরোধ অবস্থায় দ্রুত ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তে অক্সিজেন পৌঁছাতে না পারলে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

এস্‌ফিক্‌সিয়া কখন হয়

ক) শ্বাসনালী বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন–

১. পানিতে ডুবে বা এরূপ কোনো কারণে শ্বাসনালীতে তরল কোনো কিছু প্রবেশ করলে।

২. শ্বাসনালীতে বাইরের গ্যাস প্রবেশ করে, যেমন-মটরের ধোঁয়া, এমোনিয়া, কোল গ্যাস ইত্যাদি।

৩. শ্বাসনালীতে খাদ্যদ্রব্য, অচৈতন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে বমি বা বাইরের অন্য শক্ত কোনো কিছু প্রবেশ করে (পয়সা, হাড়) অচৈতন্য ব্যক্তির জিহবা উল্টে গিয়ে মুখের ভিতর কোথাও ক্ষত হয়ে বা চোয়াল ভঙ্গজনিত কারণে রক্তক্ষরণ হয়ে শ্বাসনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে ইত্যাদি।

৪. বায়ুনালীর সংকোচন (গলায় ফাঁস লেগে)

৫. নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে, যেমন– অচৈতন্য ব্যক্তি বালিশ বা অনুরূপ নরম কোথাও মুখ গুঁজে পড়ায় নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৬. আগুনে পুড়ে, মৌমাছি বা ভীমরুল গলায় হুল ফোটালে, ডিপথেরিয়া বা ঐ জাতীয় কণ্ঠনালী সংক্রান্ত রোগ দেখা দিলে তন্তুগুলো ফুলে গিয়ে।

(খ) শ্বাস প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে, যেমন–

১. অত্যধিক ভিড়ে বুকে চাপ পড়লে।

২. বিষক্রিয়া বা ধনুষ্টংকার রোগ দেখা দিলে।

৩. বুকের পেশীগুলোতে পক্ষাঘাত হলে।

৪. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটলে।

৫. বিষাক্ত ঔষধ সেবনে 'মর্ফিয়া, প্রুসিক এসিড প্রভৃতি'।

৬. অক্সিজেনবিহীন বা বদ্ধঘরে আটকা পড়লে।

লক্ষণ

১. দুর্বল ও মাথা ঘোরা, রোগীর মূর্ছাভাব।

২. শ্বাস-প্রশ্বাস অসুবিধা।

৩. নাড়ীর গতি দ্রুত এবং দুর্বল

৪. অর্ধ-চৈতন্য অবস্থা

৫. গলার শিরা ফুলে যাওয়া

৬. ঠোঁট ও মুখ নীল হয়ে যাওয়া (এস্‌ফিক্‌সিয়া গুরুত্ব অনুসারে লক্ষণ সমূহের তারতম্য দেখা যায়)।

চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতি

ক) যে-কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা রোধ কর, রোগীকে আক্রান্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত স্থানে নিয়ে যাও।

খ) রোগীর দেহে অনায়াসে যাতে মুক্ত বাতাস লাগতে পারে তার ব্যবস্থা কর। জিহ্বা উল্টে গিয়ে থাকলে তা ঠিক করার ব্যবস্থা কর (রোগী চিৎ হয়ে থাকলে এরূপ অবস্থা হতে পারে)।

গ) কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস এর ব্যবস্থা কর। এ-কাজে মোটেও বিলম্ব করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে বা ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত চালাতে হবে।

ঘ) কম্বল বা কাঁথা দিয়ে মুড়ে রোগীকে গরম রাখিতে হবে।

ঙ) নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর করতে হবে (বাড়িতে বা প্রয়োজনবোধে হাসপাতালে)।

চ) প্রয়োজনবোধে (অল্প শ্বাস চললে) গলায় আংগুল দিয়ে ফাঁক করতে হবে।

ক্ষেত্র বিশেষ প্রতিবিধান পদ্ধতি

শ্বাসরোধ

যে জিনিসের সাহায্যে গলায় চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা সরাতে হবে। রশি, বেল্ট বা কাপড় হলে ঢিলা করার ব্যবস্থা বা প্রয়োজনে কেটে ফেলতে হবে।

উর্ধ্ববন্ধ

দেহের নিচের অংশ ধরে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে ফাঁস আলগা করে দাও বা দড়ি কেটে দাও।

কণ্ঠরোধ

গলায় আটকে যাওয়া জিনিস স্থানচ্যুত করতে হলে রোগীর মাথা ও কাঁধ সামনের দিকে নুইয়ে রেখে কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে পিঠে জোরে আঘাত কর (কিল দাও)। এতেও যদি তা বের হয়ে না আসে তবে তার জিহ্বার ওপর দিয়ে তোমার দুই আঙ্গুল একেবারে কণ্ঠনালীর পেছন ভাগে প্রবেশ করাও এভাবে তাকে বমি করাবার চেষ্টা কর।

ধোঁয়ায় শ্বাসরোধের ক্ষেত্রে

এ-ক্ষেত্রে প্রথমে আত্মরক্ষার প্রয়োজন তারপর দুর্ঘটনা স্থল থেকে রোগীকে স্থানান্তর করতে হবে। ভেঁজা তোয়ালে, রুমাল বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে নিজের মুখ ও নাক বেঁধে তারপর উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হবে।

বদ্ধঘরে আটকা পড়লে দরজা খুলে বা ভেঙ্গে দাও। ভেতরে ঢুকে রোগীকে বাইরের মুক্ত বাতাসে নিয়ে আসতে হবে।

বিষাক্ত গ্যাস

ক) বাতাসের তুলনায় যেগুলো হালকা যেমন-কার্বন অক্সাইড গাড়ির পেছনে পাইপ দিয়ে যে গ্যাস বের হয়, বাড়িতে রান্নার সময় চুল্লি থেকে যে গ্যাস বের হয়, এমোনিয়া মিথেন ইত্যাদি।

খ) বাতাসের তুলনায় ভারী, যেমন– কার্বন ডাইঅক্সাইড যা ল্যাবরেটরিতে তৈরি বা কয়লার স্তূপে পাওয়া যায়, সালফিউরিটেড হাইড্রোজেন যা খোলা নর্দমায় থাকে, মেথিল ব্রোমাইড যা রেফ্রিজারেটর হতে বের হয় এবং রান্নার জন্য যে-সকল গ্যাস বের হয়।

উল্লিখিত যে-কোনো গ্যাসই কোনো আবদ্ধ জায়গায় থাকলে সেখানে প্রবেশ করে আগে জানালা দরজা খুলে নিতে হবে যাতে সেখানে বাইরের মুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে পারে।

মাথা নিচু করে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে সেখানে প্রবেশ করবে এবং যতদ্রুত সম্ভব রোগীকে স্থানান্তর করবে। দরজা জানালা খুলে দেয়ার মত ব্যবস্থা না থাকলে এবং আবদ্ধ গ্যাস মারাত্মক হলে এবং রোগীকে

বের করতে সময় লাগবে মনে করলে কোনোক্রমে মুখোশ ছাড়া সেখানে প্রবেশ করবে না।

বৈদ্যুতিক আঘাত

বিদ্যুৎপ্রবাহ আছে এমন খোলা তারের সংস্পর্শে এলে বা বজ্রপাতের সংস্পর্শে এলে দেহ বিদ্যুতায়ন হয়ে গুরুতর আঘাতের সৃষ্টি হতে পারে এরূপ আঘাত সামান্য বা গুরুতর উভয় ধরনের হতে পারে।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা আজকাল আমরা হরহামেশাই দেখতে ও শুনতে পাই। এর প্রধান কারণ হলে 'অসাবধানতা এবং অবহেলা। আগের চেয়ে এখন বিদ্যুতের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। এখন শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জে সর্বত্রই বিদ্যুতের ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে অনভিজ্ঞ ও অসাবধান লোক তা ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

বৈদুতিক তারের ওপর রাবারের আচ্ছাদন ইঁদুর বা অন্য কোনো পোকা-মাকড় কেটে ফেলার ফলে কিছু অংশ অনাবৃত হয়ে যায়। যখন ঐ তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে তখন সেই অনাবৃত অংশের সংস্পর্শে এলে বা কোনো ধাতব পদার্থে বিদ্যুৎপ্রবাহ থাকলে তার সংস্পর্শে এলে অথবা নিকটে বজ্রপাত হলে দেহে বিদ্যুতায়ন হয়।

ভেজা বা আর্দ্রতা বিদ্যুৎ প্রবাহের সহায়ক। অল্প ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ হলেও দুর্ঘটনার স্থান যদি ভেজা হয় তবে সেটাও মারাত্মক আকার ধারণ করে। দেহ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিদ্যুৎপ্রবাহ দেহে প্রবেশ করে নীচের অংশ দিয়ে মাটিতে চলে যায়। তখন কিন্তু একটু ক্ষমতাসম্পন্ন ভোল্ট হলেও তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখন হাত বা দেহের উপরের অংশ দিয়ে প্রবেশ করে নীচের অংশ দিয়ে মাটিতে চলে যায় তখন খুবই মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এরূপ ক্ষেত্রে কখনো কখনো সাথে সাথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় বা শ্বাসযন্ত্রের পেশীসমূহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। হৃদয়ন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুগুলো যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে হৃদয়ক্রিয়া চলতে পারে। এ-ক্ষেত্রে অনেকক্ষণ ধরে

কৃত্রিমউপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চালাতে হবে। জীবনরক্ষার জন্য এটি অপরিহার্য।

বিদ্যুতায়িত ও আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার

বৈদ্যুতিক আঘাতের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত বিচক্ষণতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় :

১. বৈদ্যুতিক আঘাতের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করতে হবে। যদি সুইচ হাতের কাছে না পাওয়া যায় আর তার যদি ফ্লাকসিবল হয় তবে তা জোরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এ অবস্থায় কখনই দা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে তা কাটতে যাবে না। প্লাগের সাথে সংযোগ হলে প্লাগটা খুলে দিয়েও প্রবাহ বন্ধ করা যেতে পারে।

২. আহত ব্যক্তিকে অপসারণ

বিদ্যুতায়িত বা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে রাবারে মোড়ান (ইনসুলেটিং) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় এবং অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে তা যেন শুকানো হয়। পাওয়া গেলে রাবারের গ্লাভস ব্যবহার আরও ভাল। তা ছাড়া রাবারের সোলওয়ালা জুতা, সেন্ডেল অথবা শুকনো কাটে দাঁড়িয়ে এ কাজ করা যেতে পারে। হাতের কাছে অন্য কোনো যন্ত্রপাতি না পাওয়া গেলে শুকনো লাঠি, কাঠ, শুকনো দড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উচ্চ ভোল্টযুক্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ হলে আরও অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ-ক্ষেত্রে সুইচ বন্ধ হলেও বিপদের আশংকা থেকে যায়। সুতরাং এ-কাজে বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন।

চিকিৎসা :

১। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

২। স্নায়ুবিক আঘাতের চিকিৎসা করতে হবে।

৩। দগ্ধ হলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

৪। দ্রুত ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

রোগীকে সুস্থ দেখা গেলেও ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ বা হাসপাতালে প্রেরণ অপরিহার্য।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

স্কাউট ভাইয়েরা, এ-পর্যন্ত তোমাদের সাথে যে-সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে তোমরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছ যে, প্রাথমিক প্রতিবিধানে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পুনঃসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। একটা বিষয় পূর্বাহ্নে তোমাদের জানা দরকার তা হলো যখনই উপলব্ধি করবে যে, এখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তখন আর কোনোক্রমেই সময় নষ্ট করবে না। এ-সময় তোমার প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে-সব পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে মুখ থেকে মুখ, মুখ থেকে নাক, হলজার নিলসেন, শেফার এবং সিলভেস্টার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

ক) মুখ থেকে মুখ পদ্ধতি

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি সহজ পদ্ধতি হলো 'মুখ থেকে মুখ' পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে ফুসফুসে অনেক বেশি বাতাস প্রবেশ করানো যায়। এই পদ্ধতি খুবই সহজ এবং পরিশ্রম কম হয়। অল্প বয়স্করাও অনায়াসে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সবার আগে প্রয়োগে উদ্যোগ নেয়া উচিত। যদি নাকে বা মুখে আঘাত থাকে বা অন্য কোনো অসুবিধা দেখা যায় কেবল তবেই সিলভেস্টার, হলজার নিলসেন এবং শেফার পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

এই পদ্ধতি ব্যবহারে প্রথমে রোগীর মুখের ভিতর ময়লা আবর্জনা বা কোনো পদার্থ থাকলে তা দ্রুত সরিয়ে বায়ু পথ পরিষ্কার করে নিবে এবং রোগীর গলা টান অবস্থায় চিৎ করে শোয়াবে। প্রয়োজন হলে কাঁধের নিচে কাপড় ভাঁজ করে একটু উঁচু করে দিবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গলা টান করবে–

১. শিশু কিশোরদের ক্ষেত্রে : এক হাত রোগীর ঘাড়ের নিচে রেখে ধীরে ধীরে উপরের দিকে টান। অপর হাত তার মাথায় রেখে পিছনের দিকে বাড়িয়ে দাও।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে : দুই হাতে এমনভাবে ধরবে যেন আঙ্গুলগুলো দিয়ে চোয়ালের কোণ আটকানো যায়। মাথা পিছনের দিকে বাড়ানোর সময় চোয়াল উপর দিকে চেপে দেবে।

১. কৃত্রিম শ্বাস পদ্ধতি (শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে)

এক হাতে রোগীর মাথা চেপে ধর অন্য হাতে তার নিম্ন চোয়াল ধরে মুখ ফাঁক করে নিজের মুখ যতখানি সম্ভব পুরো শ্বাস গ্রহণ কর এবং রোগীর মুখ ও নাক নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে আটকিয়ে ধরে স্বাভাবিকভাবে বাতাস প্রবেশ করাও। যখন দেখবে যে রোগীর বুক ফুলে উঠেছে তখন নিজে মুখ সরিয়ে নেবে এবং পুনরায় বাতাস প্রয়োগ করবে। এভাবে মিনিটে ২০ বারের মতো প্রয়োগ করতে হবে।

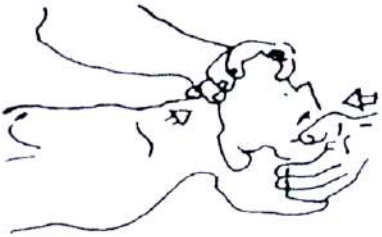

২. কৃত্রিম শ্বাস পদ্ধতি (বয়স্কদের ক্ষেত্রে)

রোগী বয়স্ক হলে তার মুখ এবং নাক এক সাথে নিজের মুখের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে না। তাই এই ক্ষেত্রে রোগীর মুখ তোমার ঠোঁট দিয়ে আটকানোর পর এক হাতে রোগীর নাক বন্ধ করে আগের মত করে বাতাস প্রবেশ করাবে এবং ছেড়ে দেবে। এ-ক্ষেত্রে মিনিটে ১০ বার করে বুক ফুলানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) মুখ থেকে নাক পদ্ধতি

যদি রোগীর মুখ খুলতে অসুবিধা হয় অথবা স্নায়ুবিক আঘাতপ্রাপ্ত হয় সে-ক্ষেত্রে মুখ থেকে নাক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

পূর্বের ন্যায় রোগীর পাশে গিয়ে গলা টান কর। নিজের মুখ খুলে পূর্ণ বাতাস গ্রহণ কর এবং নিজের মুখের মধ্যে রোগীর নাক রেখে নিজের ঠোঁট

দিয়ে আটকে ধর। খেয়াল রাখবে যেন তার নাকে কোনো বাঁধা সৃষ্টি না হয়। এবার অপর হাত দিয়ে রোগীর ঠোঁট চেপে ধর ও ধীরে ধীরে বাতাস প্রবেশ করাও। লক্ষ রাখবে এতে যদি বুক ফুলে উঠতে কোনোরূপ বাধা দেখা দেয় তাহলে প্রতিবার বাতাস প্রয়োগের পর তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিতে হবে।

যদি কখনো মুখ থেকে মুখ বা মুখ থেকে নাক পদ্ধতিতে বাতাস প্রবেশ করানো সম্ভব না-হয় অর্থাৎ বুক ফুলিয়ে তোলা সম্ভব না-হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, বায়ুপথ বন্ধ রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সাথে সাথে মুখের মধ্যে হাত দিয়ে বাইরের কিছু থাকলে তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সফল না হলে নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১. শিশুদের ক্ষেত্রে

শিশুদের মাথা নিচের দিকে করে হাঁটুর ওপর শোয়ায়ে তার দুই কাঁধের মাঝ বরাবর একটু জোরে ৩/৪ বার থাপ্পড় অথবা ছোট শিশুর ক্ষেত্রে এক হাত দুইপা ধরে উপর দিকে ঝুলিয়ে ধর এবং দুই কাধেঁর মাঝ বরাবর ৩/৪ বার থাপ্পড় দাও। এতে মুখের ভিতরে কোনো পদার্থ থাকলে তা বের হয়ে আসবে।

২. বয়স্কদের ক্ষেত্রে

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে তাকে পাশ ফিরে শোয়াও এবং মুখ একদিকে কাত করে দুই কাধেঁর মধ্যভাগ জোরে জোরে ৩/৪ বার কিল দাও। তারপর মুখের ভিতর হাত দিয়ে বাইরের জিনিস বের করে ফেল।

উভয়ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যবস্থ গ্রহণের পর পুনরায় বুকে বাতাস প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বিকল্প ব্যবস্থা

যদি দেখা যায় যে, মুখ থেকে মুখ বা মুখ থেকে নাক পদ্ধতি ব্যবহার করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না তখন কেরোটিভ আর্টারির স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করতে হবে। যদি স্পন্দন অনুভব না করা যায় তবে তার সাথে সাথে পুনরায় মুখ থেকে মুখ বা নাক পদ্ধতিতে বাতাস প্রবেশ করাতে থাকবে। এরপর রোগীকে সমতল জায়গায় টেবিল, বেঞ্চ বা মেঝেতে শোয়াবে।

১. শিশুদের ক্ষেত্রে

প্রতিবার বাতাস প্রবেশ করানোর সময় যখন বুক ফুলে উঠবে তখন সেকেন্ড একবার চাপ দিতে হবে। এভাবে ছয় থেকে আটবার চাপ দিতে হবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে

বুকের নিচের অংশ এক হাতের তালুর ওপর অপর হাত রেখে ফুসফুস প্রতিবার ফুলে ওঠার পর সেকেন্ডে এরূপ ছয় থেকে আটবার চাপ দিতে হবে।

এরূপ অবস্থায় যদি অন্তত আর একজন সাহায্যকারী পাও তবে তাকে কেরেটিভ আর্টারি পরীক্ষা করে দেখা এবং বুকে চাপ দেয়ার কাজে লাগাও।

সিলভেষ্টার পদ্ধতি (Silvester's Method)

১. রোগীর মুখ বা নাকে যদি কোনো ময়লা বা শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা ঘটতে পারে এমন কিছু থাকে তবে তা পরিষ্কার করে নাও।

২. রোগীকে চিৎ করে শোয়াও। কাঁধের অংশে একটু কাপড় ভাঁজ করে দিয়ে উঁচু করার ব্যবস্থা কর। এবার রোগীর গলা টান করে রাখ এবং গায়ের জানা খুলে দাও।

৩. রোগীর মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বস এবং তার কব্জির কাছে ধরে দিক দিয়ে তোমার দু'পায়ের কাছে আন এবং সেখান থেকে নিয়ে তার বুকের শেষ হাড় বরাবর রেখে চাপ দাও।

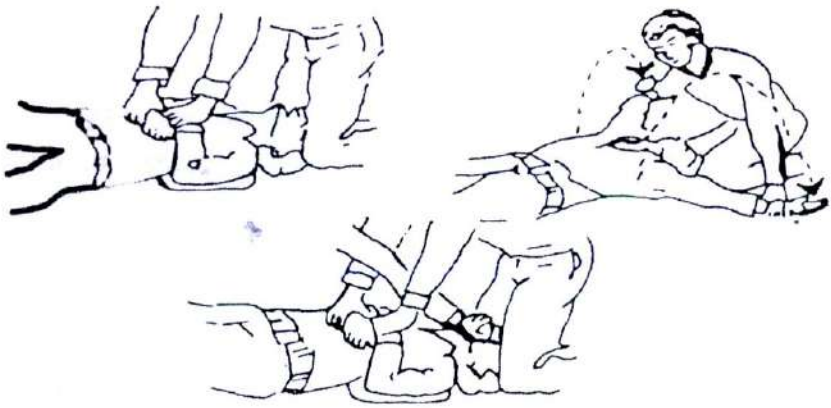

৪. বার বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এক একবার অর্থাৎ এক এক চাপে পাঁচ সেকেন্ডের মত সময় লাগবে। হাত ঘুরাতে ৩ সেকেন্ড এবং বুকে চাপ দুই সেকেন্ড। রোগীর নাকের কাছে একটা হালকা কাগজ বা তুলা ধরে দেখতে হবে শ্বাস পড়ছে কিনা, তা বুঝার জন্য শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চালাতে থাকবে।

শেফার পদ্ধতি (Schafer's Method)

১. রোগীর মুখে বা নাকে যদি কোনো ময়লা বা শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা ঘটতে পারে এমন কিছু থাকে তবে তা পরিষ্কার করে নাও।

২. রোগীকে উপুড় করে শোয়াও। হাত দু'টি মাথার দু'পাশে ছড়িয়ে দাও। মাথা একপাশ করে দাও, যাতে তার নাক ও মুখ মাটিতে ঠেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে।

৩. রোগীর মাথার দিকে মুখ করে কটিসন্ধির সমান্তরালবর্তী হয়ে এক পাশে দুই হাঁটু গেড়ে বসবে।

৪. এরপর রোগীর কোমরের দু'পাশে নিজের হাত দুটি এমনভাবে রাখ যাতে বুড়ো আঙ্গুল দুটি সামনের দিকে এবং অন্য আঙ্গুলগুলো কোমরের দু'পাশে আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে থাকে। তোমার হাত দু'টি এবং কনুই ঠিক সোজাভাবে রাখতে হবে।

৫. এবার কনুই বা বাঁকিয়ে তোমার কটিদেশ সোজা বা দৃঢ় রেখে ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে রোগীকে চাপ দাও। এই চাপের ফলে রোগীর পেটের সমস্ত টঅন্ত্রে চাপ পড়বে এবং ফুসফুসের বায়ু বেরিয়ে যাবে।

৬. চাপ দেয়া ও চাপ ছাড়া কাজ দুটি ৫ সেকেন্ডে শেষ করতে হবে। চাপ দেয়া দুই সেকেন্ডে এবং চাপ ছেড়ে থাকা ৩ সেকেন্ড। যতক্ষণ না শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয় ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

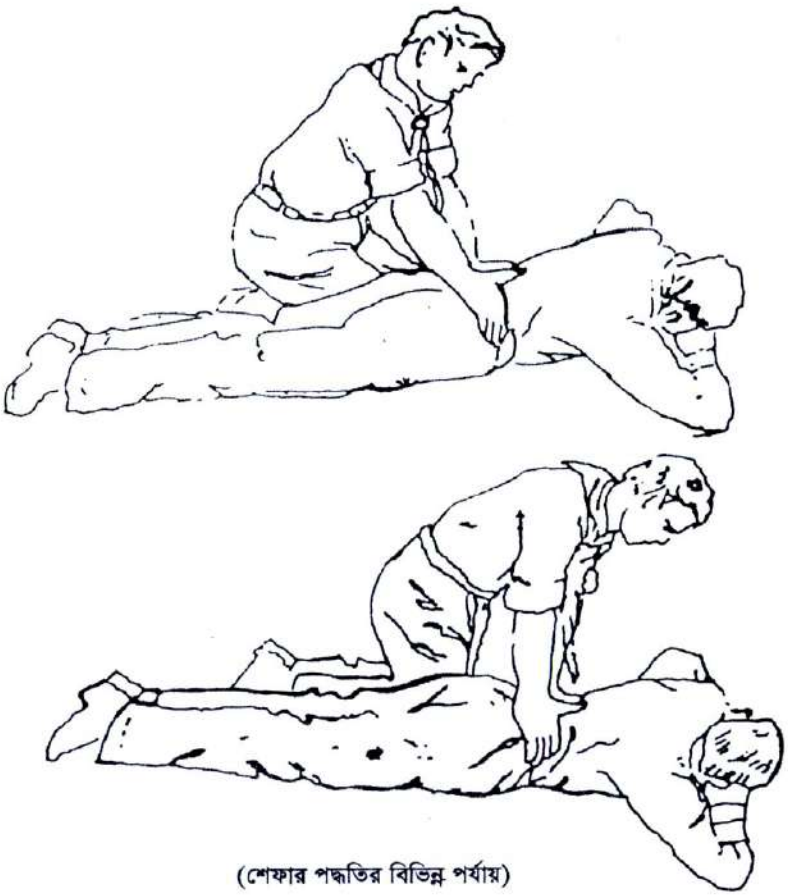

(শেফার পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়)

হলজার নিলসন পদ্ধতি (Holger Nelson Method)

প্রস্তুতি

রোগী যদি চিৎ হয়ে থাকে তবে তাকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। আর এই উপুড় করে শোয়ানোর জন্য প্রথমে ছড়িয়ে থাকা পা দুটি সোজা করে এক পায়ের ওপর অপর পা রাখ যাতে একপাশে কাত হয়ে নিচের দিকে থাকে। এবার আহত ব্যক্তির মাথার দিকে বাম হাঁটু গেড়ে আর ডান পা রোগীর পাশে মাটিতে রাখ। এবার রোগীর হাত দুটি তার মাথার উপর দিয়ে বিপরীত পাশে ঘুরিয়ে দাও। এ-সময় অপর হাত দিয়ে রোগীর মুখমণ্ডলে যাতে আঘাত লাগতে না পারে তার ব্যবস্থা করবে। এভাবে রোগীকে ডান বা বাম উভয় পাশ দিয়ে ঘোরান যাবে।

এভাবে উপুড় করে সমতল স্থানে রোগীকে শোয়াতে হবে। রোগীর মাথা একদিকে কাত করে রাখতে হবে এবং তার মাথার নিচে এক হাতের ওপর অপর হাত মিলিয়ে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন নাক ও মুখ মুক্ত থাকে।

আহত ব্যক্তির মাথা বরাবর ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি দূরে এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসবে এবং অপর পা রোগীর কনুই বরাবর রেখে পায়ের গোড়ালিতে ভর রেখে অবস্থান করবে। এরপর রোগীর পিঠে তোমার দুই হাত এমনভাবে রাখবে যেন তোমার হাতের তালুর গোড়ার অংশ রোগীর কাঁধের ওপর থাকে এবং আঙ্গুলগুলো নিম্নমুখী হয়ে পাঁজরের হাড়ের ওপর অবস্থান করে।

সঞ্চালন-১

বাহু দুটি সোজা ও শক্ত রেখে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকবে যেন তোমার দেহের ভার তার পিঠে পড়ে। এ-ক্ষেত্রে আবার বেশি জোর দেয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবে আনুমানিক দুই সেকেন্ড সময় নিতে হবে। সময় নিরূপণের জন্য মনে মনে এক দুই গুনতে পার। এরূপ চাপের ফলে রোগী শ্বাস ত্যাগ করবে।

সঞ্চালন-২

তোমাকে এখন রোগীর ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য সোজা হতে হবে। এ অবস্থায় তুমি মনে মনে তিন গুনতে পার এবং রোগী কাঁধের ওপর দিয়ে দুই হাত দিয়ে রোগীর দুই হাতের কনুইয়ের উপরে অংশে

ধরবে। দুই সেকেন্ডের জন্য কনুই দুটি টেনে উপর দিকে তুলতে হবে। উঠানোর সময় আবার মনে মনে 'চার' 'পাচ' গুনতে পার (তবে লক্ষ রাখতে হবে মাটি থেকে রোগীর বুক যেন উঠে না আসে)। এরপর আবার 'ছয়' গুনে

রোগীর বাহু মাটিতে নামিয়ে আবার আগের মত করে রোগীর পিঠে হাত রাখবে।

এভাবে এক একবারের কাজ শেষ হতে ৬ সেকেন্ড সময় লাগবে। মিনিটে ১০ থেকে ১২ বার এরূপ করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কাঁধের জয়েন্ট বা কাছাকাছি কোথাও অস্থিভঙ্গ বা সন্ধিভঙ্গ থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না।

শিশুদের ক্ষেত্রে

হলজার-নিলসন পদ্ধতিতে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার বয়সের সাথে সাথে চাপ প্রয়োগের তারতম্য ঘটবে। পাঁচ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে কেবল আঙ্গুলের অগ্রভাগের চাপ প্রয়োগই যথেষ্ট। মিনিটে ১২ বার এরূপ চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

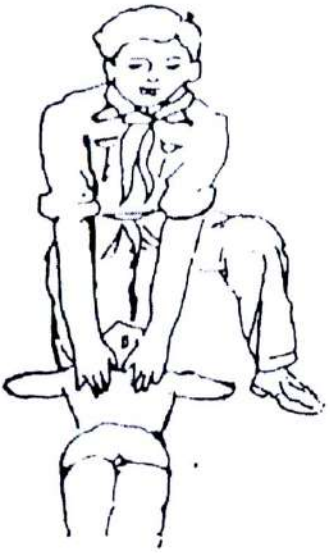

আবার পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে বাহু দু'টি পাশে রেখে শিশুর মাথার নিচে কোনো কিছুর ঠেস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাঁধের ওপর বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে বাকি আঙ্গুলগুলো নিচের দিকে নিয়ে কাঁধ ধরতে হবে।

এবার শ্বাস ত্যাগের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দুই সেকেন্ড চাপ দাও এবং শ্বাস গ্রহণের জন্য দুই সেকেন্ড সময় কাঁধে তুলে ধর। এভাবে মিনিটে ১৫ বার করতে হবে।

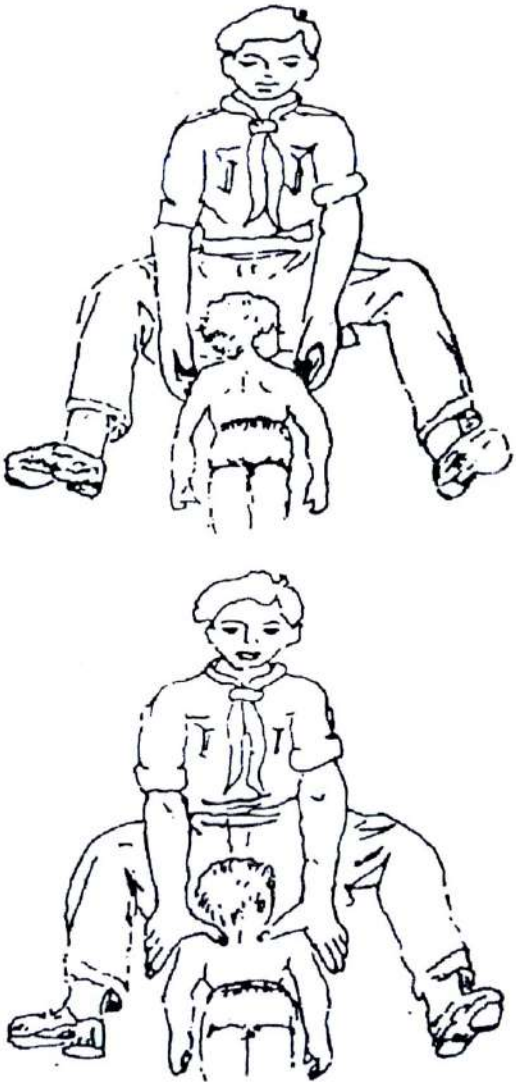

সাবধানতা

ক) যদি রোগীর বুকে আঘাত থাকে তবে কখনই চাপ প্রয়োগ করবে না। এ-ক্ষেত্রে বাহু ধরে উঠানো নামানোর ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট।

খ) বাহুতে যদি গুরুতর আঘাত থাকে সে-ক্ষেত্রে বাহুদ্বয় দেহের পাশে রেখে রোগীর কাঁধের নিচে হাত দিয়ে উঠানো এবং নামানো কাজ করতে হবে।

গ) এই পদ্ধতিতে চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনোক্রমেই মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ না করা হয়।

সুপ্রিয় স্কাউটবৃন্দ, এ-পর্যন্ত তোমরা প্রাথমিক প্রতিবিধানের অনেকটা গভীরে প্রবেশ করছে। ইতোমধ্যে তোমরা পরিচিত হয়েছ প্রাথমিক প্রতিবিধানের মূল বিষয়গুলোর সাথে। জানতে পেরেছ ক্ষত সম্পর্কে, ক্ষতজনিত কারণে রক্তপাত হলে তা কিভাবে বন্ধ করতে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক না থাকলে কী করে তা স্বাভাবিক করা যায়, এমনি আরও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। শুরুতেই মানবদেহের কাঠামোর সাথে তোমাদের পরিচিতি ঘটেছে। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে তোমরা প্রায়ই অস্থিভংগের সম্মুখীন হবে। সে-ক্ষেত্রে তা তুমি একজন প্রতিবিধানকারী হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না। তোমাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এমন রোগীকে সাহায্য করার জন্য। এ-কাজ কিন্তু তোমার জন্য মোটেও কঠিন নয়। কারণ তুমি ব্যান্ডেজ বাঁধতে শিখেছ, আহত অঙ্গ আরামপ্রদ রাখার জন্য স্লিং বাঁধতে জান। ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ স্প্রিন্ট তো তোমার কাছে রয়েছেই। তাহরে আর ভাবনা কী?

চল এবার আলোচনা করা যাক অস্থিভঙ্গ কী? কিভাবে এবং কেন অস্থিভঙ্গ হয়, আর কোন অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

অধ্যায় : ছয়

অস্থিভঙ্গ

দেহ কাঠামোর কোনো হাড় যদি ভেঙ্গে যায় তখনই তাকে অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙ্গা বলে। নিম্নলিখিত কারণে অস্থিভঙ্গ হয়ে থাকে :

১. প্রত্যক্ষ বা সরাসরি চাপ প্রয়োগ।

২. পরোক্ষ বা দূরবর্তী চাপ প্রয়োগ।

৩. পৈশিক চাপ প্রয়োগ।

সরাসরি বা প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগ

দেহ কাঠামোর কোনো অংশ সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। যেমন– প্রত্যক্ষ কোনো আঘাত, বন্দুকের গুলি, গাড়ির চাকার চাপ ইত্যাদি।

পরোক্ষ বা দূরবর্তী চাপ প্রয়োগ

দেহ কাঠামোর যেখানে আঘাতপ্রাপ্ত হলো সেখানে না ভেঙ্গে যখন তার কিছু দূরে হাড়টি ভাঙ্গে যেমন– পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু থেকে পড়ায় উরুর হাড় ভেঙ্গে যাওয়া বা হাতের তালুতে আঘাত লেগে রেডিয়াস বা আলনা অথবা কলারবোন ভেঙ্গে যাওয়া।

পৈশিক চাপ প্রয়োগ

বাহু বা মাংসপেশীতে টান পড়ে কখনো কখনো বাহু বা উরুর হাড় ভেঙ্গে যায়। পায়ে মোচড় লেগে পায়ের গোড়ালিও ভেঙ্গে যেতে পারে।

অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ

১. **সরল অস্থিভঙ্গ :** কোনো প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি না-করে যখন শুধু হাড় ভাঙ্গে তখন তাকে সরল অস্থিভঙ্গ বলে।

২. **মিশ্র অস্থিভঙ্গ :** হাড় ভেঙ্গে যখন দেহতন্তু ও ত্বক ভেদ করে ক্ষতের সৃষ্টি করে তখন তাকে মিশ্র অস্থিভঙ্গ বলে।

৩. **জটিল অস্থিভঙ্গ :** হাড় ভেঙ্গে যখন দেহের অভ্যন্তরীণ কোনো অংশ যেমন ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, শিরা বা ধমনী আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে অস্থিভঙ্গের সাথে সাথে অন্য জটিলতাও দেখা দেয় এরূপ অস্থিভঙ্গকে জটিল অস্থিভঙ্গ বলে।

৪. **বহুভঙ্গ :** এ-ক্ষেত্রে হাড় ভেঙ্গে খণ্ড হয়ে যায়।

৫. **সংবিদ্ধ অস্থিভঙ্গ :** যখন হাড় ভেঙ্গে এক অংশ অপর অংশের মধ্যে ঢুকে যায় তখন তাকে সংবিদ্ধ অস্থিভঙ্গ বলে।

৬. **গ্রীন স্টিক :** হাড় যখন না ভেঙ্গে বেঁকে যায় এবং সামান্য ফেটে যায় তখন তাকে গ্রীন স্টিক বলে। ছোট বাচ্চাদের হাড় নরম বলে তাদের ক্ষেত্রেই কেবল এরূপ হতে দেখা যায়।

৭. **ডিপ্রেসড:** মাথার খুলি ভেঙ্গে যখন নিচে বসে যায় তখন তাকে ডিপ্রেস বলে।

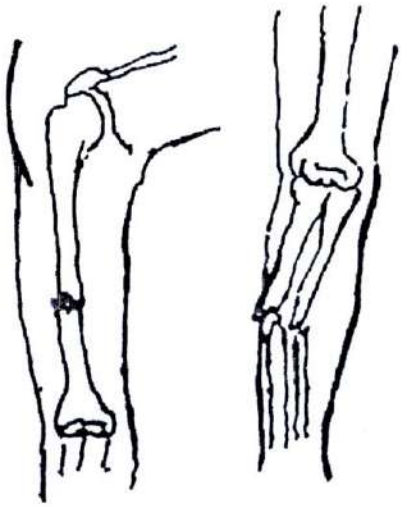

লক্ষণ

ক) ভগ্নস্থানের কাছে ভীষণ ব্যথা থাকবে।

খ) রোগী ভগ্নস্থান স্পর্শ করতে দেবে না।

গ) ভগ্নস্থান ফুলে যাবে (কখনো অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যেতে পারে)।

ঘ) রোগীর আহত অঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করতে পারবে না এবং এর স্বাভাবিক শক্তি লোপ পাবে।

ঙ) অস্থি যথাস্থানে থাকে না। ফলে আহত স্থান অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে ভাঙ্গাহাড়ের এক মাথা অপর মাথার উপরের দিকে উঠে আসে বলে ঐ অঙ্গের আকৃতি ছোট দেখা যায়।

চ) দেহের যে-স্থানের অস্থি কেবল চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত সেখানের অস্থিভঙ্গ হলে তা বাইরে থেকে হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু বা অসমান বোধ হয়।

ছ) ভাঙ্গা জায়গায় হাড় খট খট শব্দ করে।

জ) দেহের যে অঙ্গের অস্থিভঙ্গ হয় সেই অঙ্গ স্বাভাবিক সঞ্চালন ক্ষমতা হারায়।

অস্থিভঙ্গ প্রতিবিধানে সাবধানতা

১. অস্থিভঙ্গের রোগীকে ঘটনাস্থল থেকে স্থানান্তরের পূর্বে ভগ্ন অস্থি যাতে নড়াচড়া করতে না পারে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য যদি ঘটনার স্থানটি বিপদমুক্ত হয়। আর তা না হলে সত্বর বিপদমুক্ত স্থানে নিয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অস্থিভঙ্গের সাথে রক্ত ঝরতে থাকলে এবং গুরুতর ক্ষতের সৃষ্টি হলে আগে রক্ত বন্ধের প্রতিবিধান করতে হবে।

২. অস্থিভঙ্গের রোগীকে স্থানান্তরের আগে ভগ্নস্থান স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করে স্প্লিন্ট ও ব্যান্ডেজের সাহায্যে অঙ্গটি অনড় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. যে-স্থানে অস্থিভঙ্গ হয়েছে ঠিক তার ওপরই ব্যান্ডেজ বাঁধতে নেই। নড়াচড়ায় যাতে ক্ষতি না হয় সে-জন্য ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় তবে তা অত্যধিক শক্ত করে বাঁধলে অনেক সময় স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা হতে পারে। এ-বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

ক্ষেত্র বিশেষ অস্থিভঙ্গ ও তার প্রতিবিধান

মাথার খুলি

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় ধরনের আঘাতের ফলে মাথার হাড় বা শিরোস্থি ভঙ্গ হতে পারে। যানবাহনের ধাক্কা, উপর থেকে ভারী কিছু পড়া বা অন্য যে কোনোভাবে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এরূপ হতে পারে। পরোক্ষভাবে পায়ের ওপর বা মেরুদণ্ডের ওপর ভর দিয়ে পড়ার ফলেও তা হতে পারে। মাথার খুলি বা নিচের অংশ কোথাও ভেঙ্গে গেলে রোগী সাথে-সাথেই জ্ঞান হারায়। এ অবস্থায় নাক বা কান দিয়ে রক্ত বের হতে পারে এবং চোখ রক্তবর্ণ হতে পারে।

প্রতিবিধান

দ্রুত ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ কর। ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত রোগীর মাথা ও কাঁধ সামান্য উঁচু করে শুইয়ে দাও। শার্ট, গেঞ্জি বা অন্য কিছু গায়ে থাকলে তা আলগা করে দাও। প্রয়োজনবোধে রোগীকে নড়াচড়া না করে কেটে জামা কাপড় অপসারণ করবে। রোগীর দেহ গরম রাখতে চেষ্টা কর। হাতের ও পায়ের তলায় গরম পানির বোতলের সেঁক দাও। ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া গেলে খুব সাবধানে রোগীকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এ অবস্থায় কখনো রোগীকে পানি পান করতে দেবে না।

নিম্নচোয়াল

প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে সাধারণত নিচের চোয়াল ভেঙ্গে গেলে ব্যথা অনুভূত হয়, কথা বন্ধ হয়ে যায়, চোয়াল নড়াতে খুবই কষ্ট হয়, চোয়াল ধরলে অসমতার কারণে মাড়ি ও দাঁতের শব্দ হয়। রোগী বার বার থুথু ফেলে এবং থুথুর সাথে সামান্য করে রক্ত বের হয়। জটিল অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রে দাঁতের মাড়ি থেকেও রক্ত বের হয়ে থাকে।

প্রতিবিধান

রোগীকে কথা বলতে দেবে না। রোগীকে এমনভাবে বসাবে যেন সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। আহত অস্থির ওপর তোমার হাতের তালু রেখে ধীরে ধীরে উপরের চোয়ালের দিকে তুলে ধর। এবার একটি সরু ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ চিবুকের নিচে স্থাপন কর এবং প্রান্ত দু'টি দুই পাশ দিয়ে কানের উপর দিয়ে নিয়ে একটি প্যাঁচ দাও। এবার ছোট প্রান্তটি কপালের উপর দিয়ে এবং বড় প্রান্তটি মাথার পেছনে ঘুরিয়ে এক কানের উপরিভাগে রিফনট দাও।

সাবধানতা

· রোগী বমি করতে চাইলে সাথে সাথে ব্যান্ডেজ খুলে সম্মুখ দিকে মুখ ফিরায়ে এবং রোগীর নিচের চোয়ালের নিচে তোমার হাতের তালু রাখ। বমি করা হওয়ার পর আবার আগের মত করে ব্যান্ডেজটি বেঁধে দাও।

রোগীর আঘাত খুব মারাত্মক না হলে সামনের দিকে মাথা ঝুলিয়ে রেখে চলতে দিতে পার। আর আঘাত গুরুতর হলে স্ট্রেচারে করে বহন করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে একটি কম্বলের ওপর রোগীকে উপুড় করে শোয়ায়ে ঐ কম্বলের দ্বারা স্ট্রেচার তৈরি করতে হবে। এমনভাবে রোগীকে রাখতে হবে যাতে দুই হাতলের ওপর কপাল ঠেস দিয়ে মাথা রাখতে পারে এবং তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। এ-জন্য আর একটি কম্বল ভাঁজ করে তার বুকের নিচে দাও।

মেরুদণ্ডভঙ্গ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মেরুদণ্ড ভঙ্গ হতে পারে। ভারী কোনো কিছু পিঠের ওপর পড়লে বা উঁচু স্থান থেকে কোন দণ্ড, সিঁড়ি বা এরূপ শক্ত কোন কিছুর ওপর পড়লে, এমনকি সমান জায়গায় চিৎ হয়ে পড়লেও প্রত্যক্ষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মেরুদণ্ড ভঙ্গ হতে পারে। আবার ভারী কোনো কিছু মাথার ওপর পড়ার ফলেও পরোক্ষভাবে মেরুদণ্ডের অস্থিভঙ্গ হতে পারে। মেরুদণ্ডের অস্থিভঙ্গ খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ-ক্ষেত্রে রোগী জ্ঞান হারায় এবং নিম্নাঙ্গের শক্তি লোপ পায় ও পরবর্তীকালে পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

প্রতিবিধান

রোগীকে মোটেও নড়াচড়া করতে দেয়া যাবে না। অচৈতন্য অবস্থায় যাতে সে কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় জিহবা আটকে শ্বাস কষ্ট হয়ে থাকে। ডাক্তারের সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত রোগীকে কম্বল দিয়ে ঢেকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে এবং সকল সময় রোগীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ডাক্তারের সাহায্য পেতে দেরী হলে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১। রোগীর পায়ের গোড়ালী হাঁটু ও উরুর মধ্যে ভাল করে প্যাড বসাও।

২। দুই পা ও গোড়ালী জড়িয়ে ফিগার অব এইট অর্থাৎ ইংরেজি আটের মত করে পায়ের তলার দিকে রিফনট দিয়ে বেঁধে দাও।

৩। হাঁটু ও উরুতে প্যাডসহ চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধ।

সাবধানতা

চিৎ করে শোয়ায়ে রোগীকে স্থানান্তরিত করতে হবে। সকল সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে কোনোক্রমে রোগী নড়াচড়া করতে না পারে।

স্থানান্তর পদ্ধতি

মেরুদণ্ড ভঙ্গ রোগীর জন্য শক্ত স্ট্রেচারে আবশ্যক। সাধারণত স্ট্রেচারে হার্ডবোর্ড বিছিয়ে নিয়ে তা করা যেতে পারে। স্ট্রেচার না হলে একটি চওড়া তক্তা ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগীর মেরুদণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য পিঠের কিছু অংশ বালিশে ঠেস দিয়ে রাখতে হবে। রোগীকে স্ট্রেচারে উঠানোর সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে আহত স্থানে টান না পড়ে। এ-জন্য একজন বাহককে মাথা ও মুখ ধরে রাখতে হবে যেন কোনোক্রমে মাথা ঘাড় নড়ে না যায়। সেই সাথে অপর একজন বাহককে পায়ের গোড়ালির অংশেও ধরতে হবে যাতে মেরুদণ্ডের কাছে নড়াচড়া না হয়।

পাঁজরভঙ্গ

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় আঘাতেই পাঁজরের অস্থিভঙ্গি হতে পারে। প্রত্যক্ষ আঘাত হলে ভগ্নাস্থি ভিতরের দিকে বসে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে। এ-ক্ষেত্রে ফুসফুসে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। আবার বুকের সামনে বা পিঠের দিকে চাপ লেগে পাঁজরের মধ্যভাগ ভাঙ্গতে পারে। এরূপ পরোক্ষ ভঙ্গের ক্ষেত্রে ভগ্নাস্থির প্রান্ত বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।

লক্ষণ

১। ভগ্নস্থানে ব্যথা হয় এবং পূর্ণ শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। কাশির সময় এই ব্যথা আরও বেড়ে যায়।

২। ব্যথা লাঘবের জন্য রোগী ছোট করে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

৩। ভগ্ন স্থানে স্পর্শ করলে একটা শব্দ অনুভূত হয়।

৪। দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হলে সে লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিবিধান

১. আহত স্থানের ঠিক নিচে এবং আহত স্থানের ঠিক উপরে দুটি চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধ। ব্যান্ডেজ দুটি এমনভাবে বাঁধবে যাতে প্রথম ব্যান্ডেজটির অর্ধেক অংশ করে আবৃত করে দ্বিতীয়টিতে অবস্থান নেয়। ভগ্নাস্থি যথাস্থানে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। উভয় ব্যান্ডেজের প্রান্ত আহত দিকের অপর পাশে রিফনট দিয়ে বেঁধে রাখবে। এ-ক্ষেত্রে গায়ে গেঞ্জি বা অনুরূপ কিছু থাকলে তা খুলতে যাওয়া মোটেও ঠিক নয়। এতে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে কোট বা অনুরূপ আলগা কিছু থাকলে তা খোলা যেতে পারে।

২. রিফনট দেয়ার আগে রোগীকে যতটুকু সম্ভব শ্বাস ত্যাগ করে বুক খালি রাখার পরামর্শ দিতে হবে।

৩. একটি আর্ম স্লিংিং দিয়ে আহত পার্শ্বের হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

৪. যদি এই ব্যবস্থা নেয়ার পর ব্যথা বৃদ্ধি পায় তাহলে এগুলো সবই খুলে ফেলতে হবে।

কণ্ঠাস্থি ভঙ্গ

সাধারণত পরোক্ষ আঘাতের ফলে কণ্ঠাস্থি ভঙ্গ হয়। কাঁধ অথবা হাতের উপর ভর দিয়ে চলার ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

যে-দিকের কণ্ঠাস্থি ভঙ্গ হয় সেদিকের হাত অনেকটা কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এতে রোগী ঐ হাতকে অন্য হাত দিয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করে এবং তার মাথা আহত দিকে হেলে যায়। আহত স্থানে হাত দিলে অনায়াসে বোঝা যায় যে, ভগ্ন হাড়ের একটি অপরটির ওপর রয়েছে এবং ভেতরের দিকের অংশটি বাইরের দিকের অংশের উপরে অবস্থান করছে।

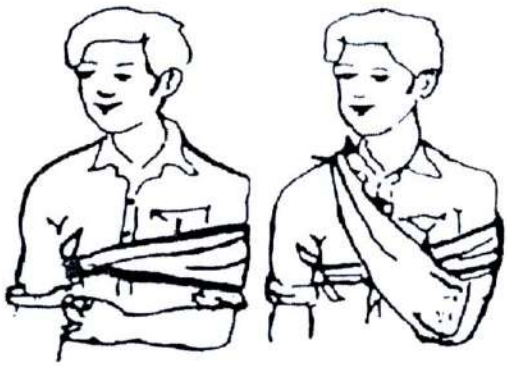

প্রতিবিধান

১। আহত দিকের বাহু প্রতিবিধানকারীর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে রাখবে।

২। আহত দিকের বগলে অর্থাৎ উর্ধ্ব বাহু ও বুকের মাঝ বরাবর প্যাড দিতে হবে।

৩। একটি চওড়া ব্যান্ডেজের সাহায্যে আহত দিকের উর্ধ্ববাহু বুকের দিকে টেনে নিয়ে আহত দিকের বিপরীত দিকে বাঁধতে হবে যেন অগ্রবাহু মুক্ত থাকে।

৪। একটি ত্রিকোণ স্লিং-এর সাহায্যে অগ্রবাহু ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

কাঁধের অস্থিভঙ্গ

কাঁধের অস্থি খুব কমই ভাঙতে দেখা যায়। কেবল প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে এই অস্থিভঙ্গ হয়। সাধারণত সরাসরি ভারী কোন কিছুর আঘাত বা যানবাহনের দুর্ঘটনায় এরূপ হয়ে থাকে।

প্রতিবিধান

১. একটি ত্রিকোণ স্লিং-এর সাহায্যে আহত দিকের উর্ধ্ববাহুকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

২. বসিয়ে রোগীকে স্থানান্তর করতে হবে।

উর্ধ্ববাহু ভঙ্গ

সাধারণত কাঁধ ও কনুইর কাছে বা কনুইর মাঝামাঝি স্থানে উর্ধ্ববাহু ভঙ্গ হয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তির জামা-কাপড় খুলে ফেলার প্রয়োজন হয় না।

প্রতিবিধান

১. আহত হাতের কনুই ভাঁজ করে বুকের ওপর এমনভাবে রাখ যেন ঐ হাতের আংগুল অপর দিকের কাঁধ স্পর্শ করে।

২. বুক এবং ঐ হাতের মধ্যবর্তী স্থানে প্যাড স্থাপন কর।

৩. কব্জিতে যেন তেমন চাপ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে কলার অ্যান্ড কাপ স্লিং-এর সাহায্যে হাতটি ঝুলিয়ে রাখ।

৪. একটি চওড়া ব্যান্ডেজের সাহায্যে আহত পাশের কাঁধের ওপর দিয়ে দেহ জড়িয়ে বিপরীত দিকে এনে বেঁধে দাও।

৫. আর একটি চওড়া ব্যান্ডেজ আহত হাতের কনুইর ওপর দিয়ে দেহ জড়িয়ে বিপরীত দিকে বেঁধে দাও।

সাবধানতা

ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে আহত হাতের কব্জির কাছে নাড়ী টিপে দেখতে হবে যে, স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা, যদি তা না হয় তবে অবশ্যই ব্যান্ডেজ ঢিলা করে দিতে হবে। যদি অন্য কোনো অসুবিধা না দেখা যায় তাহলে রোগীকে হেঁটে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

কনুই যদি ভাঁজ করা না যায়

সাধারণত মিশ্র অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রে এবং কনুইর একেবারে কাছে উর্ধ্ববাহুর অস্থিভঙ্গ হলে কনুই ভাঁজ করতে দারুণ কষ্ট হয়। সে-ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং স্ট্রেচারে রোগীকে বহন করতে হবে।

প্রতিবিধান

১। রোগীকে শুইয়ে দিয়ে আহত হাতটি লম্বাভাবে রোগীর পাশে এমন করে রাখ যেন হাতের তালু রোগীর উরু স্পর্শ করে।

২। দেহ এবং উর্ধ্ব ও নিম্নবাহুর মধ্যবর্তী স্থানে পরিমাণ মত প্যাড দাও।

৩। তিনটি চওড়া ব্যান্ডেজ নিয়ে নিম্নরূপভাবে বাঁধ :

- দেহ ও বাহু জড়িয়ে
- দেহ ও কনুই জড়িয়ে
- কব্জি ও উরু জড়িয়ে

অগ্রবাহু ভঙ্গ

অগ্রবাহুতে দুটি অস্থি রয়েছে (১) রেডিয়াস (২) আল্না। এর একটি অথবা দুটি ভাঙ্গতে পারে। যদি একটি ভাঙ্গে তাহলে ব্যথা হয়, ফুলে যায় এবং শক্তিহীনতা ও অসমতা লক্ষ করা যায়। দুটি হাড়ই ভাঙ্গলে সকল চিহ্নই বর্তমান থাকে। কব্জির কাছে রেডিয়াস বেশি ভাঙ্গতে দেখা যায়।

প্রতিবিধান

১. ঊর্ধ্ব বাহুর সাথে সমকোণ করে অগ্রবাহু এমনভাবে স্থাপন কর যেমন হাতের তালু দেহের দিকে থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল উপরের দিকে থাকে।

২. কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত দুটি প্যাডযুক্ত স্প্লিন্ট স্থাপন কর।

৩. স্প্লিন্ট সহ দুটি ব্যান্ডেজ বাঁধ। একটি ভগ্নস্থানের উপরে এবং অপরটি কব্জি জড়িয়ে ফিগার অব এইট অর্থাৎ বাংলা (৪) সংখ্যার মত।

৪. আর্ম স্লিং-এর সাহায্যে আহত অগ্রবাহু ঝুলিয়ে রাখ।

বস্তিভঙ্গ

পেলভিস বা বস্তিদেশের অস্থি খুব কম ভাঙ্গতে দেখা যায়। তবে প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে একটি ভঙ্গ হয়। যেমন– যানবাহনের বা অন্যান্য ভারী কোনো কিছুর পতনের ফলে এরূপ ঘটে। বস্তিদেশের অস্থিভঙ্গ হলে দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র, বিশেষ করে মূত্রাশয় ও মূত্রনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-ক্ষেত্রে নিম্নরূপ চিহ্ন দেখা দেয়।

১. কটিদেশে খুব ব্যথা বোধ হয়। নড়াচড়া এবং হাঁচি বা কাশির সময় ব্যথা আরও বেড়ে যায়।
২. কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দেখা যায়।
৩. প্রস্রাবে খুবই কষ্ট হয় এবং প্রস্রাব লাল রঙের হয়।
৪. রোগী দাঁড়াতে পারে না।

সাবধানতা

১. রোগী যেভাবে শুলে অপেক্ষাকৃত আরামবোধ করে তাকে সেভাবেই শুতে দেয়া প্রয়োজন। তবে সোজাভাবে চিৎ করে শোয়ানো ভাল।

২. রোগী যদি প্রস্রাব না করে থাকতে পারে তবে সেটাই উত্তম।

৩. হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বেশি সময় না লাগলে স্ট্রেচারে করে রোগীকে বহন করা যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে ব্যান্ডেজের প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু সময় বেশি লাগলে তবে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে প্রতিবিধান করতে হবে।

প্রতিবিধান

১. দুটো চওড়া ব্যান্ডেজ নিয়ে বস্তিদেশ এমনভাবে বাঁধ যেন আঘাতপ্রাপ্ত বস্তিদেশের দিকে ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ থাকে এবং একটি ব্যান্ডেজ অপর ব্যান্ডেজ অর্ধেকটার ওপর থাকে। আর যেদিকে আঘাত নেই সেদিকে রিফনট দিতে হবে।

২. গোড়ালি ও হাঁটুর কাছে এবং মাঝের ফাঁক অংশে পরিমিত পরিমাণ প্যাড দিতে হবে।

৩. গোড়ালি ও পা প্যাঁচিয়ে ফিগার অব এইট দাও, যেন পায়ের তলার দিকে রীফনট দিতে পারে।

৪. সব শেষে উভয় হাঁটু প্যাঁচিয়ে আর একটি চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। এরূপ ব্যান্ডেজ বাঁধার ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে যেন ব্যান্ডেজের শেষ প্রান্তের যে রিফনটগুলো যে পাশে আঘাত নেই সে পাশে এক বরাবর হয়।

উরুর অস্থিভঙ্গ

বয়স্ক ব্যক্তিদের সামান্য আঘাতেই উরুর অস্থিভঙ্গ হতে দেখা যায়। উরুর যে-কোনো স্থান ভঙ্গ হতে পারে। উরুর অস্থিভঙ্গ অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ এতে আশেপাশের তন্তুতে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে এবং স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দেয়।

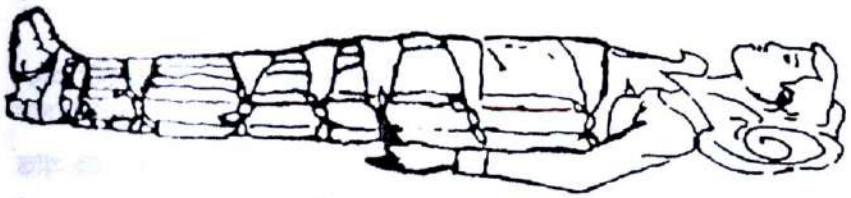

প্রতিবিধান

১. আহত উরুর বাইরের দিকে বগল থেকে পা পর্যন্ত লম্বা একটি স্প্লিন্ট স্থাপন কর। অপর একটি স্প্লিন্ট দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন কর।

২. স্প্লিন্টে অবশ্যই ভাল করে প্যাড জড়িয়ে দিতে হবে এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে ভাল করে প্যাড দিয়ে নিতে হবে।

৩. স্প্লিন্ট সহ দু'পা জড়িয়ে ফিগার অব এইট দিতে হবে।

৪. নিম্নরূপভাবে ৭টি ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে :

১) বগলের ঠিক নিচে বুক জড়িয়ে;

২) বস্তিদেশ, জংঘা সন্ধির সমান্তরালে;

৩) পা ও গোড়ালির কাছে পায়ে;

৪) অস্থিভঙ্গের ঠিক নিচে উভয় উরু নিয়ে;

৫) উভয় পা জড়িয়ে;

৬) উভয় পায়ের হাঁটু জড়িয়ে (একটি চওড়া ব্যান্ডেজ) বাঁধতে হবে।

হাঁটুভঙ্গ

প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে সাধারণত জানুফলক ভঙ্গ হতে দেখা যায়। এ-ক্ষেত্রে জানুফলক দু'ভাগ হয়ে যায়। এরূপ ভঙ্গের ক্ষেত্রে ভগ্নস্থান বেশ ফুলে যায়, শক্তি লোপ পায় এবং ফাঁক হয়ে যায়।

প্রতিবিধান

১. আহত ব্যক্তিকে চিৎ করে শোয়াও। পিঠ ও মাথা উঁচু কিছুতে ঠেস দিয়ে রাখ।

২. আহত পায়ের পেছন দিকে নিতম্বের নিম্নভাগ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একটি প্যাডযুক্ত স্প্লিন্ট স্থাপন কর।

৩। নিম্নরূপভাবে তিনটি ব্যান্ডেজের সাথে স্প্লিন্ট বেঁধে দাও–

ক. স্প্লিন্টসহ উরুজড়িয়ে একটি চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধ।

খ. গোড়ালি ও পা জড়িয়ে স্প্লিন্টসহ ফিগার অব এইট একটি সরু ব্যান্ডেজ বাঁধ।

গ. হাঁটুর একটু উপরে একটি সরু ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ স্থাপন করে প্রান্ত দুটি স্প্লিন্টসহ জড়িয়ে হাঁটুর ঠিক নিচে এনে রিফনট বেঁধে দাও।

৪। রোগী বহন করার সময় তার আহত পা যেন উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। গোড়ালির দিকে ২/৩টা বালিশ দিয়ে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পদভঙ্গ

কখনো একটি আবার কখনো বা দুটি অস্থি ভংগ হতে পারে। দুটি অস্থি ভংগ হলে অস্থিভঙ্গের সকল চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় আর কেবলমাত্র কিবিউলা ভঙ্গ হলে বিকৃত ভাব পরিলক্ষিত হয়।

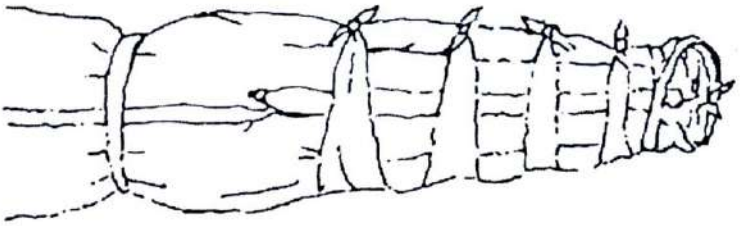

প্রতিবিধান

১. দু'পায়ের মধ্যে বগল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত প্যাডযুক্ত স্প্লিন্ট স্থাপন করে।

২. পা দুটো সোজা করে রাখ। যতখানি সম্ভব ব্যথা না দিয়ে এ কাজ করতে হবে।

৩. প্রয়োজনমত উরু, পা ও গোড়ালিতে স্প্লিন্ট-এর দুই পাশে প্যাড স্থাপন কর।

৪. দু'পায়ের গোড়ালি জড়িয়ে ফিগার অব এইট বাঁধ।

৫. দুই উরু জড়িয়ে একটি চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধ।

৬। দুই হাঁটু জড়িয়ে একটি চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধ।
৭। একটি সরু ব্যান্ডেজ ভগ্নস্থানের উপরে এবং আর একটি সরু ব্যান্ডেজ ভগ্নস্থানের নীচে বাঁধ।

সাবধানতা

যদি এক পায়ের অস্থিভঙ্গ হয় হবে ভাল পায়ের দিকে রিফনট দিবে আর যদি উভয় পা ভঙ্গ হয় তবে পা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত সেদিকে রিফনট বাঁধবে।

পায়েরপাতা ভঙ্গ

পায়ের পাতার অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রে যদি বোঝা যায় যে রক্তপাত হচ্ছে বা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সে-ক্ষেত্রে পায়ে জুতা বা মোজা থাকলে তা খুলে ফেলতে হবে আর যদি তা না হয় তাহলে জুতা মোজা খোলার কোনো প্রয়োজন হবে না। ক্ষত থাকলে আগে ক্ষতের প্রতিবিধান দিতে হবে। তারপর অস্থিভঙ্গের প্রতিবিধান করতে হবে।

প্রতিবিধান

১. ক্ষতের প্রতিবিধানের পর পায়ের গোড়ালি থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত মাপের একটি প্যাডযুক্ত স্প্লিন্টে নাও।

২. ফিগার অব এইট-এর সাহায্যে স্প্লিন্টটিকে পায়ের পাতার সাথে আটকাও।

৩. একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ওপর পা-টি রাখ। এবার ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি আড়াআড়ি করে ঘুরিয়ে গোড়ালির পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এনে রিফনট দিয়ে বেঁধে দাও।

৪. পা একটু উঁচুতে আরামপ্রদভাবে রাখ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ক্ষত না থাকলে পায়ের জুতা না খুলে জুতার ওপর ফিগার অব এইট বাঁধতে পার। এতে জুতাই স্প্লিন্ট-এর কাজ করবে। পা-টি উঁচুতে আরামপ্রদ অবস্থায় রেখে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। রোগী স্থানান্তরের কাজে স্ট্রেচারে ব্যবহার করতে হবে।

সন্ধিচ্যুতি

একটি অস্থি আর একটি অস্থির সাথে যে জায়গায় মিলেছে সেটা অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান, আর এই সন্ধিস্থান থেকে যদি কোনো অস্থি সরে যায় তবে তাকে সন্ধিচ্যুতি বলে। কাঁধ, কনুই, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্নচোয়াল ও হাঁটুতে সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়।

লক্ষণ

১. সন্ধিস্থলে ভীষণ ব্যথা করে।

২. নড়াচড়া করা যায় না।

৩. সন্ধিস্থলে অঙ্গের বিকৃতি ঘটে।

৪. বেশ ফুলে যায়।

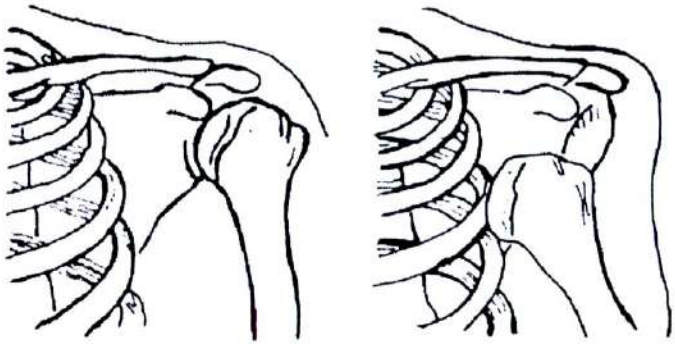

প্রতিবিধান

স্থান বিশেষে এর প্রতিবিধান কিছুটা ভিন্ন হলেও একটি বিষয় সকল সময় খেয়াল রাখতে হবে। তা হলো অযথা টানাটানি করে অস্থিটি স্বস্থানে বসানোর চেষ্টা না করে রোগী যেভাবে আরামবোধ করে সেভাবেই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

মচকানো

সন্ধিস্থলের হাড় সঞ্চালনের সময় হঠাৎ সন্ধির চারপাশের স্নায়ুতন্তুর ওপর টান পড়ে ছিঁড়ে গেলে তাকে মচাকানো বলে।

লক্ষণ

১. সন্ধি স্থলে বেশ ব্যথা হয়।
২. স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা যায় না।
৩. বেশ ফুলে যায়।
৪. মচকানো স্থান নীল বা লাল বর্ণ ধারণ করে।

প্রতিবিধান

১. আহত স্থান নড়াচড়া করতে দেয়া যাবে না।
২. আহত স্থানটি আরামদায়কভাবে রাখতে হবে।
৩. আহত প্রত্যঙ্গ সামান্য উঁচুতে রাখতে হবে।
৪. আহত সন্ধিস্থলে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।
৫. ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় তা ভিজিয়ে নিতে হবে এবং সকল সময় তা ভিজা রাখতে হবে। সম্ভব হলে ব্যান্ডেজের ওপর বরফের টুকরা রেখে আর একটি আলগা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবে।
৬. এতে স্বস্তি না পাওয়া গেলে পুরো ব্যান্ডেজ খুলে পুনরায় বাঁধতে হবে।

স্কাউট ভাইয়েরা, আমার বিশ্বাস এখন তোমরা বিপদগ্রস্ত লোকের সেবায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এ-পর্যন্ত যে জ্ঞান তোমাদের হয়েছে তা দিয়ে তোমরা অনায়াসে তাদের সাহায্য করতে পারবে। আর যখনই তোমরা সঠিকভাবে একজন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে পারবে দেখবে তোমাদের মনটা কেমন আনন্দে ভরে ওঠে। এ-কাজ করে তোমরা যে তৃপ্তি পাবে আর কোনো কাজে তা পাবে না।

তোমাদের পরিচিত মহল, প্রবিবেশী, বন্ধু সবার বিশ্বাস 'তাদের কেউ বিপদগ্রস্ত হলে একমাত্র তোমরাই তাকে সাহায্য করতে পারবে।' তাই তারা ছুটে আসবে তোমাদের কাছে। আর তোমরা তো 'সবার জন্য সদা প্রস্তুত' এই মহান মন্ত্রে দীক্ষিত। তাই তোমাদের আরও কিছু অতি সাধারণ বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। যে-ধরনের বিপদ-আপদ তোমাদের আশে পাশে যে-কোনো সময় ঘটতে পারে। যেখানে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে সেই বিষয়গুলো তোমাদের জানা দরকার। এ-কারণেই এখন সে-সব বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

অধ্যায় : সাত

দাহ

দাহ দুই ধরনের ক. শুষ্কদাহ খ. আদ্রদাহ

শুষ্কদাহ

নিম্নবর্ণিত কারণে এরূপ দাহজনিত ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

১. আগুনের শিখা, গরম ধাতব পদার্থ, শুষ্ক উত্তাপ ও রৌদ্র।

২. কোনো কিছুর ঘর্ষণ লেগে। ঘুরন্ত চাকা, চলমান দড়ি, বারংবার একই স্থানে কোনো কিছুর ঘর্ষণ (নতুন জুতা বা অনুরূপ কিছু)

৩. উচ্চ ভোল্টযুক্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ আছে এরূপ ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে আসা অথবা বজ্রপাত।

৪. রাসায়নিক ক্রিয়া।

ক) ক্ষারজাতীয়, যেমন– এমোনিয়া, কুইক লাইম, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাস ইত্যাদি।

খ) এসিড জাতীয় যেমন সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইত্যাদি।

আদ্রদাহ

নিম্নলিখিতভাবে আদ্রদাহজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– ফুটন্ত পানি, গরম তেল, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

দাহ যে প্রকারেই হোক না কেন দেহে তার প্রতিক্রিয়া একই পরিলক্ষিত হয়। দাহের ফলে ত্বক লাল হয়ে যায়, ফোস্কা পড়ে এবং দেহ তন্তুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-ক্ষেত্রে ভীষণ ব্যথা এবং ব্যথার কারণে স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দেয়।

প্রতিবিধান

১. যতটুকু না করলেই নয় তার চেয়ে বেশি কোনোক্রমেই রোগীকে নড়াচড়া করা যাবে না।

২. দগ্ধ কাপড়-চোপড় গায়ে লেগে থাকলে তা খোলা যাবে না এবং কখনো

ফোস্কা গলাবে না।

৩. জীবাণুমুক্ত শুকনো ড্রেসিং বা লিন্ট দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে রাখতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায় তবে শুকনো পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ফোস্কা পড়লে বা ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে আলগাভাবে অন্যথায় অপেক্ষাকৃত শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।

৫. রোগী ক্ষতস্থান যাতে নড়াচড়া করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দিলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

৮. মুখমণ্ডল দগ্ধ হলে লিন্ট বা একটি পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে একটি ছিদ্র করে ছিদ্রটি নাকের ফাঁকে রেখে মুখোশের মত করে মুখমণ্ডল ঢেকে দিয়ে তারপর সেটাকে যথাস্থানে আটক করার জন্য নিম্নচোয়ালে যেভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় সেভাবে বাঁধতে হবে।

রাসায়নিক পদার্থে দগ্ধ প্রতিবিধান

১. রাসায়নিক পদার্থে দগ্ধের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই বিলম্ব না করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. গায়ের জামা কাপড়ে এসিড লেগে থাকলে তা দ্রুত অপসারণ করতে হবে।

৩. দগ্ধস্থানে পর্যাপ্ত পানি ঢালতে হবে। সম্ভব হলে আহত স্থান পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪. এক পোয়া (পাইন্ট) গরম পানিতে দুই চামচ বেকিং সোডা (খাবার সোডা) বা ওয়াসিং সোডা (কাপড় কাঁচার সোডা) মিশিয়ে ক্ষার লোশন প্রস্তুত করে ঐ লোশন দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শুষ্কদাহের অনুরূপ প্রতিবিধান করতে হবে।

ক্ষার পদার্থে দগ্ধ হলে

চুনে পুড়ে গেলে দ্রুত গায়ে লেগে থাকা চুন অপসারণ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং লেবুর রস বা ভিনেগার সমপরিমাণ গরম পানি দিয়ে এসিড

লোশন তৈরি করে সেটা দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং শুষ্কদাহের অনুরূপ প্রতিবিধান প্রদান করতে হবে।

কামড় বা দংশন

কুকুর, শিয়াল, বানর, বাঘ ইত্যাদি প্রাণীর দেহে এক প্রকার মারাত্মক রোগ দেখা দেয়, একে জলাতংক বলে। এরূপ জলাতংক রোগাক্রান্ত জন্তু মানুষকে কামড়ালে বা থাবার সাহায্যে আঁচড় কাটলে ঐ প্রাণীর দেহের জলাতংকের জীবাণু মানুষের দেহে সহজেই প্রবেশ করে এবং সেই ব্যক্তি জলাতংকে আক্রান্ত হয়।

জলাতংক রোগগ্রস্ত জন্তু কামড়ালে ১৫ দিন থেকে ৮ মাসের মধ্যে মানবদেহে তার পূর্ণতা লাভ করে এবং জলাতংক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে কামড়ের বা আঁচড়ের স্থানে জ্বালা করে, কখনো কখনো আবার জ্বালা করে না। রোগী বেশ চঞ্চল হয়ে পড়ে, মোটেও ঘুমায় না, জ্বর দেখা দেয় এবং নাড়ী বেশ দ্রুত চলতে থাকে। আক্রান্ত হওয়ার এক দুইদিনের মধ্যেই দারুণ মানসিক উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সাথে ছটফট করতে থাকে।

এই মারাত্মক রোগ থেকে রোগীকে রক্ষা করতে হলে সাথে সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১. দংশনের রোগীকে সাথে সাথে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবে এবং পরে ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে।

২. দংশনকারী প্রাণীটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। লক্ষ রাখবে সেটির আচরণের জলাতংকের লক্ষণ দেখা যায় কি না।

৩. ১০ দিন পর্যন্ত ঐ প্রাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। জলাতংকগ্রস্ত হলে সেটি অবশ্যই ১০ দিনের মধ্যে মারা যাবে। আর তখন নিশ্চিত হওয়া যাবে যে কুকুরটি জলাতংকগ্রস্ত ছিল। যদি সেটি মারা না যায় তাহলে তেমন উদ্বেগের কারণ নেই।

৪. যদি দংশনকারী প্রাণীটির খোঁজ পাওয়া না যায় তবে বিলম্ব না করে প্রাথমিক প্রতিবিধানের পর ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

জলাতংকগ্রস্ত কুকুরের লক্ষণ

১. রোগগ্রস্ত কুকুরটির চাহনীতে আতঙ্কভাব পরিলক্ষিত হবে।

২. নাগালে যা কিছু পায় তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে চেষ্টা করবে।

৩. খাবার পাত্র কামড়াতে থাকে।

৪. পানি খেতে চায় কিন্তু পানি দিলে তা দেখে ভয় পেয়ে ছটফট করে পালাতে চেষ্টা করে।

৫. পিছনের পা ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসে।

৬. শরীরে কম্পন দেখা দেয়।

৭. স্বরের পরিবর্তন ঘটে।

৮. অবশেষে দেহে খিঁচুনি আরম্ভ হয়, মুখে ফেনা ওঠে এবং শেষ পর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

১. রক্ত পড়তে থাকলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে না বরং রক্তপাত হতে দেবে এবং ক্ষতস্থান নিচুতে রাখবে।

২. সাবান দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলবে।

৩. তীব্র কারবলিক এসিড সরু কাঠিতে করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও।

৪. ক্ষত চোখের কাছে হলে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন এসিড চোখের বা চোখের খুব কাছাকাছি না লাগে।

৫. এসিড না পাওয়া গেলে পটাশিয়াম পারমাংগানেটের গুঁড়ো বা খুব ঘন করে গলানো পটাসিয়াম পারমাংগানেট লাগিয়ে ধীরে ধীরে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

শুধু জলাতঙ্কের হাত থেকে নয় সকল জন্তুর কামড় বা আঁচড়ে এই প্রতিবিধান করা প্রয়োজন।

সর্পদংশন

আমাদের দেশে হরহামেশাই সাপে কাটার ঘটনা ঘটে থাকে। তবে সকল সাপের দংশনই যে মারাত্মক তা নয়। যখন বিষধর সাপে দংশন করে তখনই মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। তবে সমস্যা হলো দংশনকারী সাপটি বিষাক্ত না বিষহীন তা চেনা। কারণ সকল সময় দংশনকারী তাকে দেখা বা চেনার আগেই সে সরে যায়। এ-ছাড়া দংশিত ব্যক্তি ভয়ে এমন হয়ে যায় যে দংশনকারীর দিকে ফিরে তাকানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আর একটি দিক হলো, মানুষ যেমন সাপ দেখে ভয় পায়, সাপও তেমনি মানুষ দেখে ভয় পায়। ফলে উভয়ে উভয়কে এড়িয়ে চলে। যখন সাপ আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা নিজের নিরাপত্তার অভাব মনে করে তখনই আঘাত প্রদানকারীকে দংশন করে। সাপ ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম, বড় ঘাস, ইঁদুরের গর্তে বা গাছের গর্তে অবস্থানকালে যখন সাপের গায়ে মানুষের পাড়া বা হাত লাগে তখনই সাপ ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য দংশন করে। আর এ-কারণেই পায়ে এবং হাতে সাপের দংশন বেশি পরিলক্ষিত হয়।

বিষাক্ত সাপের দংশন চেনার উপায়

কামড়ানো জায়গায় প্রায় এক ইঞ্চি ব্যবধানের সূক্ষ্ম রক্তাক্ত দাঁত বসার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট আর একটি সামান্য পরিলক্ষিত হয়। এরূপ পরিলক্ষিত হলেই বুঝতে হবে তা বিষাক্ত সাপের কামড়।

আর যদি দুয়ের অধিক বা খাড়া অথবা অর্ধচন্দ্রাকারের দাগ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তা বিষাক্ত সাপ নয়।

সাপে কমড়ের লক্ষণ

হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা, ঘুমের ভাব, বমি বমি ভাব, দুর্বলতবোধ। পরিবর্তিত শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টবোধ, ঢোক গিলতে কষ্ট, নাড়ি দ্রুত চলতে থাকে এবং মাঝে মাঝে তা বন্ধ হয়ে যায়। মাংসপেশীতে খিঁচুনি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি লোপ পায়, ক্রমশ বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে থাকে। আহত অঙ্গের শিরাগুলো ফুলে লাল হয়ে যায়। গায়ে ঘাম দেয়, খিঁচুনি আরও বেড়ে যায়। রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে রোগী মারা যায়।

প্রতিবিধান

১. প্রথমেই শিরার মধ্য দিয়ে রক্তের চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। অগ্রবাহু বা পায়ে কামড়ালে প্রথমে উর্ধ্ববাহু বা উরুর মাঝামাঝি স্থানে একটি তারপর তার নীচের দিকে অর্থাৎ হাঁটু/কনুইয়ের একটু উপরেই আরেকটি এইভাবে দুই জায়গায় বাঁধতে হবে। ২৫/৫০ মিনিট পরপর বাঁধনগুলো ১/২ মিনিটের মতো সময়কালের জন্য একটু ঢিলা করে দিতে হবে এবং আবার তা শক্ত করে বাঁধতে হবে।

২. কামড়ের জায়গা ধারালো ব্লেড বা চাকুর সাহায্যে যোগ চিহ্নের মতো করে ৩/৪ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করে কেটে তাতে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেটের গুঁড়ো দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রথমে কিছু পানি ঢেলে পরে আবারও ভাল করে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেটের গুঁড়ো দিয়ে দিতে হবে।

৩. রোগীকে কোনোক্রমেই বিশ্রাম করতে দেয়া যাবে না।

৪. পান করতে পারলে গরম চা বা কফি খেতে দিয়ে রোগীকে গরম রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৬. নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আনার চেষ্টা করতে হবে।

৭. হাত-পা ছাড়া দেহের মধ্যভাগে কোথাও সাপে কামড়ালে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত ক্ষতস্থান ছিঁড়বে না। তবে এ-ক্ষেত্রে অন্য করণীয়সমূহ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।

বিভিন্ন অবস্থা ও তার প্রতিবিধান

বিষক্রিয়া

আজকাল আমাদের দেশে ক্ষেতের পোকা ধ্বংসের জন্য নানা ধরনের বিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অসাবধানতাবশত ক্ষেতের পোকা ইঁদুর মারার বিষ ঘরে রাখা হলে তা মুখে দিয়ে অবুঝ ছোট শিশু আক্রান্ত হয়। এমনকি অভিমানের বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে পান করার ঘটনাও অহরহ ঘটছে।

প্রতিবিধান

১. দ্রুত ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা কর।

২. কী ধরনের বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তা বোঝার জন্য অবশিষ্ট বিষ, কৌটা/শিশি বা তার ঢাকনা অথবা যাতে বিষ ছিল বলে সন্দেহ করা হয় সেই পাত্র, কিম্বা বমি করে থাকলে সেগুলো সংরক্ষণ কর।

৩. অজ্ঞান হয়ে থাকলে

ক) মাথা একদিকে করে উপুড় করে শোয়াও।

খ) রোগীর জিহবা পরিষ্কার রাখ।

গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা মৃদু হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা কর। মনে রাখবে ডাক্তার আসার আগ পর্যন্ত এই অবস্থা চালাতে হবে।

৪. যদি জ্ঞান থাকে

ক) বমি কমানোর ব্যবস্থা কর। মুখের ভিতরে হাত দিয়ে অথবা ডিমের শ্বেতাংশ খাইয়ে বমি করানো যায়। তাতেও কাজ না হলে এক গ্লাস ঈষৎ গরম পানিতে চা চামচের দুই চামচ লবণ মিশিয়ে কয়েকবার খাওয়ালেই বমি হয়ে যাবে।

ধুতরা বিষ

আমাদের দেশে মাঝে মাঝে দুবৃত্তরা ধুতুরা বিষ ব্যবহার করে সরল সহজ মানুষকে বিপদে ফেলে তার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যায়। ধুতুরা বিষে মানুষ একেবারে সাথে সাথে মারা যায় না।

লক্ষণ

কণ্ঠনালী শুকিয়ে যায়, মুখে লালা আসে, গা গরম হয়ে যায়, অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, হাত পা ছুড়াছুড়ি করতে থাকে, প্রলাপ বকতে থাকে, চোখের তারা নিশ্চল হয়ে পড়ে, ক্রমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে অবশেষে মারা যায় সেরে উঠার পরও এই বিষের ঘোর তার বেশ কিছুদিন থেকে যায় এবং চোখের তারা বিস্ফোরিত হতে থাকে।

প্রতিবিধান

১. রোগীকে বমি করানোর ব্যবস্থা কর। কাঁচা ডিমের সাদা অংশ, গরম ঘি, তেঁতুল গোলা পানি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ খাওয়ালে রোগী বমি করে থাকে।

২. ভেজা কাপড় দিয়ে হাত, মুখ, ঘাড়, গলা, মুছে দাও।
৩. রোগীকে গরম রাখার চেষ্টা কর। কড়া চা, কফি ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেতে দাও।
৪. প্রয়োজন হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার দ্বারা তার শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক রাখার চেষ্টা কর।
৫. দ্রুত ডাক্তারের কাছে পাঠাও।

জোঁক, এঁটেল বা ঐ জাতীয় রক্ত শোষক কীট

ডোবা, নালা, বিলজাতীয় জলাশয়, স্যাঁতসেঁতে ঝোপ-ঝাড়ে এ-ধরনের কীটের বাস। এরা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর রক্ত শোষণ করে জীবন ধারণ করে। এদের মধ্যে জোঁক ও এঁটেল পোকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা একবার কামড় দিয়ে ধরতে পারলে সহজে ছাড়ে না। টেনে ছাড়াতে গেলে ফল আরও খারাপ হয়।

প্রতিবিধান

১. এ-সব কীটের গায়ে লবণ দিলে বা পেছন দিকে জ্বলন্ত দিয়াশলাই বা সিগারেট অথবা পেট্রোল দিলে সাথে সাথে ছেড়ে দেয়।
২. ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে কামড়ের জায়গায় বেশ রক্তপাত হতে থাকে। তবে স্থানটিতে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলেই রক্তপাত বন্ধ হবে (স্থানীয় ভাষায় থানকুনি/ টাকাপাতা/ঢোলমানিক ইত্যাদি নামের পাতা হাতের তালুতে ডলে কামড়ের জায়গায় চেপে ধরলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়)।
৩. ম্যাথেলিটেড স্পিরিট দিয়ে তুলার সাহায্যে স্থানটি পরিষ্কার করে দাও।

মৌমাছি/ বোলতা/ ভিমরুলের হুল ফোটা

মৌমাছি ও বোলতার হুল ফোটানো ঘটনা আমাদের দেশে সকল অঞ্চলেই হর-হামেশা ঘটে থাকে। হুল ফোটায় ভীষণ জ্বালা করে। অনেক সময় স্নায়ুবিক আঘাতও দেখা যায়। মৌমাছি ও বোলতার চেয়ে ভিমরুলের হুল ফোটালে আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

প্রতিবিধান

১। স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দিলে আগে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

২। সাবধানতার সাথে হুল বা শালগুলো তুলে ফেলতে হবে।

৩. আহত স্থানের জ্বালা কমানোর জন্য সোডিয়াম বাই কার্বনেট বা এমোনিয়া লাগিয়ে দিতে হবে।

৪. সোডিয়াম বাই কার্বনেট বা এমোনিয়া না পাওয়া গেলে মৌমাছির ক্ষেত্রে মৌমাছির মধুর প্রলেপও বেশ ফলদায়ক।

চোখের মধ্যে কিছু পড়লে

বাইরের কোনো কিছু চোখের মধ্যে পড়লে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ধুলা-বালি, ক্ষুদ্র পোকা, খসে পড়া চোখের পাতার লোম, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি চোখের মধ্যে গিয়ে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কখনো এটা সামান্য থেকে খুবই গুরুতর আকার ধারণ করে।

প্রতিবিধান

১. কোনোক্রমে রোগীকে চোখ ডলতে দেয়া যাবে না।

২. যদি বাইরের কিছু প্রবেশ করে চোখের গোলকে একেবারে আটকে না গিয়ে থাকে তবে তা পাতলা ভেজা কাপড় বা রুমালের কোণা দিয়ে বের করে আনতে হবে। চোখের নিচের পাতা ধরে নিচের দিকে টেনে তা সহজে বের করা যেতে পারে।

৩. যদি চোখের গোলকে তা আটকে গিয়ে থাকে তবে কোনোক্রমেই বের করার চেষ্টা না করে এক খণ্ড পরিষ্কার তুলা গোল করে চোখের ওপর ব্যান্ডেজ করে দিবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দাও।

৪. চোখের পাতার নিচে যদি কোনো কিছু প্রবেশ করে তাহলে উপরের পাতার লোম টেনে ধরে নিচের পাতার উপরে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে কয়েকবার করলে নিচের পাতার লোমের সাথে তা বের হয়ে আসবে। এ-ক্ষেত্রে নিচের পাতার লোমগুলো ব্রাশের মত কাজ করে।

এ-ছাড়া আরও একটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে

রোগীকে আলোর দিকে মুখ করিয়ে বসাও এবং একটি দিয়াশলাই-এর কাঠি দিয়ে উপরের পাতার আধ ইঞ্চি পরিমাণ উপরের দিকে কাঠিটি স্থাপন কর এবং উপরের পাতার লোম ধরে উপরের দিকে টান। টান পেয়ে পাতাটা উল্টে যাবে।

এতে অনায়াসে পাতলা ভেজা কাপড়ের কোণা দিয়ে বাইরের জিনিস বের করে আনা যাবে।

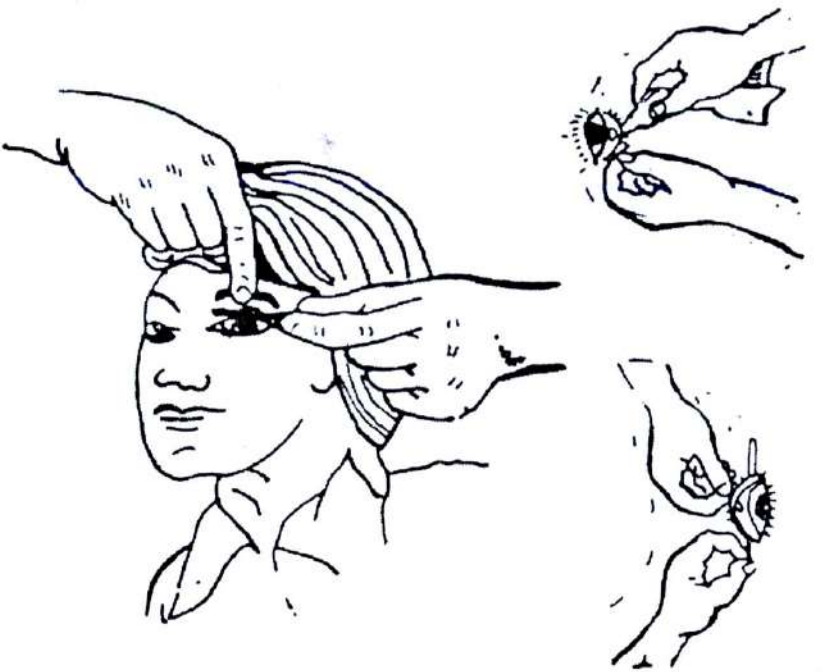

৫. চোখে বালি গেলে একটা বালতি বা বাটিতে পানি ভরতি করে তার ভিতর চোখ ডুবিয়ে রোগীকে চোখ মেলতে বল। একটু পর পর মুখ তুলে রোগী নিজের প্রয়োজন মত নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে। এভাবে কয়েকবার করার পর চোখ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৬. চোখে এসিডজাতীয় কিছু গেলেও একইভাবে চোখ পানিতে ডুবাতে হবে অথবা পানির ছিটা বার বার দিতে হবে। পরে তুলার প্যাড প্রস্তুত করে হালকাভাবে বেঁধে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

কানে কিছু প্রবেশ করলে

অনেক সময় কানের ছিদ্র পথে ছোট কীটপতঙ্গ প্রবেশ করে বেশ অস্বস্তিকর

পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যদি এরূপ কোনো কীটপতঙ্গ প্রবেশ করে তবে কানের ছিদ্র পথে অলিভওয়েল বা সার্জিক্যাল স্প্রিট দিতে হবে। এতে পতঙ্গটি ভেসে উঠে এলে অনায়াসে তা সরিয়ে ফেলা যাবে। তবে বাইরের শক্ত কোনো কিছু হলে তা নাড়াচাড়া না করে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

অজ্ঞান অবস্থা

মাথায় প্রয়োজনীয় রক্তসঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে রক্তচাপ কমে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বা অন্য কোনোভাবে ভয় পেয়ে অথবা দুঃসংবাদ শুনে হঠাৎ করে রক্তচাপ কমে যায়। অসুস্থতাজনিত দুর্বলতার কারণেও এমন হতে পারে।

লক্ষণ

১. মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হতে পারে।

২. নাড়ি দুর্বল ও মন্থর হতে পারে।

৩. শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর গতিতে চলতে পারে।

প্রতিবিধান

১. গলা, বুক ও কোমরের আলগা করে দাও।

২. যাতে পর্যাপ্ত মুক্ত বাতাস রোগীর গায়ে লাগে তার ব্যবস্থা কর।

৩. রোগীকে যে চৌকি/খাট/বেঞ্চে শোয়ানো হয়েছে সেটার যেদিকে রোগীর পা রয়েছে সেদিকটা ইট বা কোনো কিছুর সাহায্যে একটু উঁচু করে দাও যেন পায়ের দিকের চেয়ে মাথার দিক কিছুটা নিচে থাকে।

৪. ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখমণ্ডল, কানের পিঠ ও ঘাড় মুছে দাও।

৫. জ্ঞান আসার পর যখন সুস্থ বোধ করবে তখন তাকে দাঁড় করাও এবং একটু পানি পান করতে দাও।

স্কাউট ভাইয়েরা, এ-পর্যন্ত যে অধ্যায়গুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি আর তোমরা যা শিখেছ তাতে তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। তোমরা স্থির নিশ্চিত যে, এখন তোমরা বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি তোমাদের সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে। তোমরা নিশ্চয়ই

সতর্কতার সাথে খেয়াল করেছ ইতোপূর্বে যত অধ্যায়ে রোগীর চিকিৎসার কথা অর্থাৎ প্রতিবিধানের কথা বলা হয়েছে ততবারই যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

রোগী বহন

'প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী ডাক্তার নয় আর ডাক্তারের ভূমিকা গ্রহণ করাও তার কাজ নয়'। এ-ক্ষেত্রে অনেক সময়ই রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে। নিজে যেতে না পারলেও ডাক্তারের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন হবে।

সুতরাং রোগীকে স্থানান্তরিত করা বা বহন করাও কিন্তু প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যদি ও 'উদ্ধার কাজ' নামক পুস্তিকায় এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে তথাপি রোগী বহনের সহজ এবং সাধারণ কয়েক নিয়ম বা পদ্ধতি তোমাদের জানা দরকার।

রোগী স্থানান্তরিত করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

(ক) প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী একা বা অন্য একজন সাহায্যকারীকে সাথে নিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া।

(খ) একাধিক ব্যক্তি মিলে স্ট্রেচারে করে বহন করা।

(গ) চাকাযুক্ত ট্রলি বা অনুরূপ কোনো বাহনের সাহায্যে বহন করা।

কিন্তু প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধাজনক ব্যাপার হলো, কোথায়, কী অবস্থায়, কী ধরনের রোগী পাওয়া যাবে আর হাতের কাছে কী ধরনের বাহন ব্যবস্থা থাকবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী স্কাউটকে হতে হবে 'উপায়জ্ঞ'। অবস্থার নিরিখেই তাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আঘাতের ধরন বা রোগীর অবস্থা, আঘাতের গুরুত্ব, কতজন নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারী পাওয়া যাবে, ঘটনাস্থল থেকে যেখানে স্থানান্তরিত করা হবে তার দূরত্ব, পথের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বহন পদ্ধতি নিরূপণ করতে হবে।

রোগী বহন পদ্ধতি

১. ক্রেডল (Cradle) বা পাঁজাকোলা

অল্পবয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে যদি সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয় সে-ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তোমার এক হাত রোগীর দুই উরুর নিচে রাখ এবং অন্য হাত দিয়ে তার পিঠ জড়িয়ে ধরে উঠিয়ে পাঁজাকোলা করে বহন কর।

২. হিউম্যান ক্রাচ (Human Cratch)

রোগীর আহত পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে রোগীর কোমর প্যাঁচিয়ে ধর এবং রোগীর যে-হাত তোমার দিকে সে-হাত তোমার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে তোমার বুকের ওপর আন এবং তোমার খালি হাত দিয়ে ভাল করে তার কব্জিতে ধর। এভাবে রোগী তার দেহের অর্ধেক ভার নিজের সুস্থ্য পার্শ্বে এবং আহত পাশের অর্ধেক ভার তোমার ওপর রেখে অগ্রসর হতে পারবে।

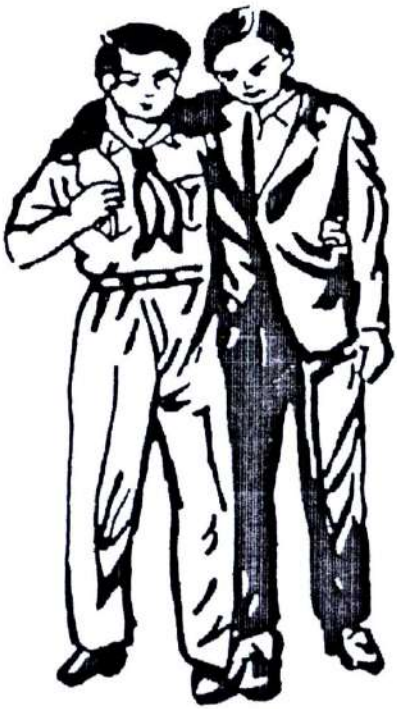

৩. পিক-এ-ব্যাক (Pick-a-back)

রোগী যদি অচৈতন্য অবস্থায় না থাকে তাহলে তাকে তোমার পিঠে করে বহন করতে পার। এ-ক্ষেত্রে রোগী তোমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে থাকবে আর তুমি দু'হাতে তার দুই উরু জড়িয়ে ধরে থাকবে। তবে রোগীর হাত বা উরু আহত হয়ে থাকলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবে না।

৪. ফায়ার ম্যান্স লিফট অ্যান্ড ক্যারী (Fire mens lift and carry)

যখন দেখবে রোগী খুব ভারী নয় অনায়াসে তুমি তাকে তুলতে পারবে এমন ক্ষেত্রে রোগীকে টেনে দাঁড় করিয়ে রোগীর ডান হাতের কব্জি তোমার বাম হাত দিয়ে ধর এবং রোগীর তলপেট তোমার ডান কাঁধের ওপর রাখ আর তার ছড়ানো বাহুর মাঝ দিয়ে তোমার মাথা ঢুকিয়ে দাও। এবার তোমার ডান হাত দিয়ে রোগীর পা জড়িয়ে ধর। এ অবস্থায় তোমার বাম হাত মুক্ত থাকবে।

এবার সোজা দাঁড়িয়ে তোমার ডান হাত দিয়ে রোগীর ডান হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে অগ্রসর হও।

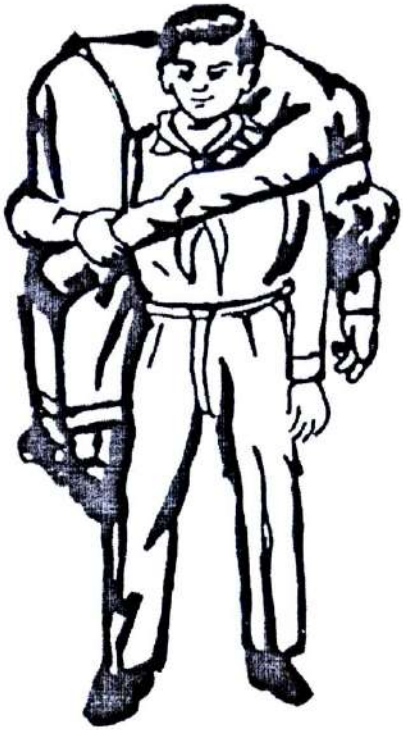

৫. হাতের আসন (Hand seat)

তোমার সাথে যদি আর একজন সাহায্যকারী পাও তবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার। রোগী তার দুই বাহু এমনকি একবাহু দিয়েও যদি বহনকারীকে ধরে রাখতে পারে কেবল সে-ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে।

তোমরা যে-দুইজন বাহকের কাজ করবে তারা প্রথমে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের ডানহাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। তারপর বাম হাত দিয়ে পরস্পরের ডান হাতের কব্জি ধরবে দেখবে এতে সুন্দর চৌকোনা একটি আসন তৈরি হয়েছে।

এবার ঐ অবস্থায় রোগীর পেছনে একটু নিচু করে আসনটির ওপর রোগীকে বসতে বল ও রোগীর দু'হাত দিয়ে তোমাদের দুই বাহকের কাঁধ জড়িয়ে ধরতে বল। এভাবে আসনে বসিয়ে অনায়াসে রোগীকে স্থানান্তরিত করতে পারবে।

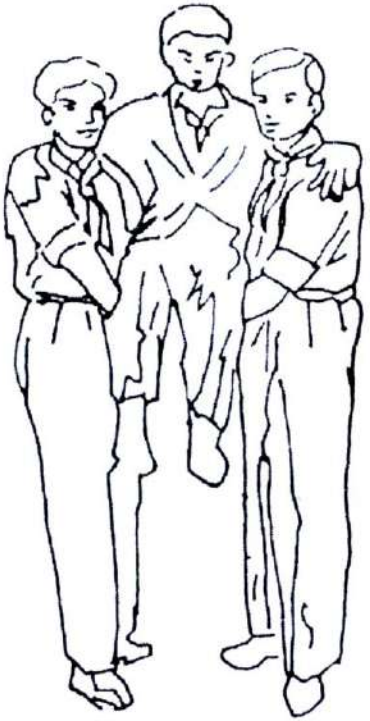

এ অবস্থায় অগ্রসর হওয়ার সময় যে-বাহক রোগীর ডান পাশে থাকবে সে বাম-পা এবং যে-বাহক রোগীর বাম পাশে থাকবে সে ডান-পা বাড়িয়ে এক সাথে হাঁটবে।

৬. দুই হাতের আসন (Two hand seat)

যদি দেখা যায় যে, রোগী তার হাত দিয়ে বাহককে ধরতে পারছে না সে-ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগীর দুই পাশে দু'জন বাহক পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পায়ের পাতায় ভর করে বসবে। তোমাদের যে-কাঁধ রোগীর কাঁধের কাছাকাছি ঐ পাশে হাত দিয়ে রোগীর কাঁধের একটু নিচ দিয়ে নিয়ে একইভাবেই উভয়েই জড়িয়ে ধরবে। তারপর রোগীর উরুর মধ্যভাগের বরাবর নিচ দিয়ে তোমাদের অপর হাত প্রবেশ করাবে। রোগীর বাম পার্শ্বে অবস্থানকারী তার হাত চিৎ করে রাখবে আর ডান পার্শ্বের বাহক অপর জনের হাতের ওপর হাত উপুড় করে রাখবে। এরপর উভয়ে এক সাথে হাত মুষ্টিবদ্ধ করবে।

এবার উভয় বাহক এক সাথে দাঁড়াবে। অগ্রসর হওয়ার সময় রোগীর ডান পার্শ্বের বাহক তার ডান-পা এবং বাম পার্শ্বের বাহক তার বাম-পা এক সাথে ফেলে সমান তালে হাঁটবে।

৭. দি ফোর অ্যান্ড এফ্‌ট মেথড (The four and aft Method)

রোগীকে হাতের আসনে বসাতে অসুবিধা পরিলক্ষিত হলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। রোগীর দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে পায়ের দিকে মুখ করে একজন বাহক দাঁড়াবে। অপর বাহক রোগীর পিছনে দাঁড়িয়ে তার বগলে নিচে দিয়ে ধরবে।

প্রথম বাহক এবার রোগীর হাঁটুর নিচ দিয়ে বাইরের দিক থেকে জড়িয়ে ধরবে এবং উভয়ে এক সাথে রোগীকে উঠাবে। এ-ক্ষেত্রে উভয় বাহককে একসাথে চলতে হবে।

সুপ্রিয় স্কাউট ভাইয়েরা, 'সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব' তোমাদের স্কাউট জীবনের মূল মন্ত্রের এই মহান বাক্যটির বাস্তব রূপ দিতে এখন সত্যি তোমার প্রস্তুত হয়েছ এ বিশ্বাস অনায়াসে করা যায়।

শেষ কথা

এ-পর্যন্ত আলোচনায় তোমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এর থেকে ধরে নেয়া যায় কোনো বিপদগ্রস্ত লোকের সেবার জন্য তোমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তবে একটা কথা নিশ্চয়ই তোমরা স্বীকার করবে যে, প্রাথমিক প্রতিবিধানের এই বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে চর্চা করা দরকার। অন্যথায় ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য সব বিষয় ভুল গেলে তা পরবর্তীতে শুধরে নেয়া যায়। কিন্তু প্রাথমিক প্রতিবিধানে ভুল হলে সে সুযোগ কোথায়? একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী স্কাউট হতে হলে তোমাদের উপদলের সদস্যদের সাথে নিয়ে নিয়মিত চর্চা রাখতে হবে। আমার বিশ্বাস তোমরা তা করবে এবং নিজেদের গড়ে তুলবে সুদক্ষ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী ও গর্বিত স্কাউট হিসেবে।

স্রষ্টা তোমাদের সহায় হোন।